দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হোন

মই মার্কায় ভোট দিয়ে বামপন্থার অন্যতম শক্তি বাসদ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে

নির্বাচনী ইশতেহার

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কেন্দ্রীয় কমিটি
২৩/২ তোপখানা রোড (৩য় তলা) ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৮২২০৬; ফ্যাক্স : ৯৫৫৪৭৭২; E-mail : mail@spb.org.bd

Scanned with CamScanner

নির্বাচনী ইশতেহার

মূল কথা

প্রিয় দেশবাসী,

৩০ ডিসেম্বর ২০১৮, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন তারিখ ঘোষিত হয়েছে। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত দশটি সংসদ নির্বাচন হয়েছে। [৭ মার্চ ১৯৭৩, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, ৭ মে ১৯৮৬, ৩ মার্চ ১৯৮৮, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, ১২ জুন ১৯৯৬, ১ অক্টোবর ২০০১, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮, ৫ জানুয়ারি ২০১৪]; আমরা ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯৬ (ফেব্রুয়ারি) ও ২০১৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিনি। বাকীগুলোতে করেছি। যে ৬টি নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে হয়েছে, তার সবকটিতেই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরাই ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। আবার দলীয় সরকারের বাইরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে নির্বাচনগুলি হয়েছে তার সবকটিতেই ক্ষমতাসীন দলের পরাজয় ঘটেছে। উভয় প্রক্রিয়ার কোনটিতেই জনগণের ক্ষমতায়ন বলতে যা বুঝায় তা হয়নি। অর্থাৎ, জনগণের শাসন তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়নি। তবে দল বহির্ভূত সরকারের অধীনে আপেক্ষিক অর্থে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ছিল এবং নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা বদলের সুযোগ ঘটেছিল। যা এখন দুঃসাধ্য প্রায়।

নির্বাচন কী এবং কেন প্রয়োজন?

সামন্তবাদী ব্যবস্থায় ছিল রাজতন্ত্র। অর্থাৎ রাজা-বাদশাহদের শাসনকালে কোন নির্বাচন ছিল না। তারা মনে করতেন, প্রচার করতেন এবং যাজকতন্ত্রকে দিয়ে প্রচার করাতেন যে তারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাদের ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তাই জনগণের কাজ শুধু ঈশ্বরের প্রতিনিধিকে মান্য করে চলা। কারণ রাজাকে মানা মানে ঈশ্বরকে মানা। ক্ষমতার পরিবর্তন তথা রাজার উত্তরাধিকার রাজা হবে। বংশ পরম্পরায় তা চলবে। জনগণের ভূমিকা কিছু নেই। রাজতন্ত্রের এই ছিলো বিধান। বুর্জোয়া শ্রেণি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে আনলো গণতন্ত্রের ধারণা। অর্থাৎ জনগণই ক্ষমতার উৎস ও মালিক। জনগণের স্বার্থে কল্যাণে ও ইচ্ছায় তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে। সেই প্রতিনিধি ঠিক করার প্রক্রিয়া হিসাবে এসেছে নির্বাচন ব্যবস্থা। বুর্জোয়া বিপ্লবে দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী ছিল ফরাসী বিপ্লব। সেই বিপ্লবের পতাকাবাহী সৈনিকদের পতাকায় খচিত ছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণি যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পত্তন ঘটালো তা ছিল শোষণমূলক ও বৈষম্য সৃষ্টিকারী। ১৮৪৮ সালে মনীষী কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশতেহার রচনা করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও অর্থনীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে অর্থনীতিতে বৈষম্য বহাল রেখে

Scanned with CamScanner

সমাজে-রাজনীতিতে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আর শ্রমজীবী জনগণের উপর শোষণ চালিয়ে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় না। উৎপাদন, বিলিবণ্টন এবং শাসন প্রশাসনের সর্বত্র জনগণের কর্তৃত্ব ছাড়া জনগণের শাসন তথা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হয় না। বুর্জোয়া গণতন্ত্রেও তাত্ত্বিক অর্থে জনগণ ক্ষমতার মালিক হওয়ার পূর্বশর্ত তাদের মৌলিক ৬টি অধিকার যেমন অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজের নিশ্চয়তা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ যেমন স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, মুক্তভাবে লিখিত বা মৌখিক মত প্রকাশ করা, সভা-সমাবেশ করা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হাসিলের জন্য সংগঠন করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত ও আন্দোলিত করা, শাসন প্রশাসনের সকল স্তরে প্রতিনিধি নির্বাচন করা, আইনের আশ্রয় পাওয়া ইত্যাদি বাধাহীন ও সুরক্ষা থাকা। রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বস্তরে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতা চর্চার ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক থাকা। এগুলি নিশ্চিত করার জন্য বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র, পুলিশ প্রশাসনসহ অপরাপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীসমূহ, সাংবিধানিকসহ স্বায়ত্তশাসিত, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি গণতান্ত্রিক নীতিপদ্ধতিতে গড়ে তোলা, কার্যকারিতাসম্পন্ন করে পরিচালনা করা। পুঁজিবাদ যখন অবাধ প্রতিযোগিতার স্তরে ছিল তখন বুর্জোয়া শ্রেণি আপেক্ষিক অর্থে গণতান্ত্রিক চর্চাকেও অনেকটা অবারিত রাখতে বাধ্য এবং সক্ষম ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদ যখন মার্কস বর্ণিত একচেটিয়া রূপ লাভ করলো তখন বুর্জোয়া রাজনীতিও কর্তৃত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হলো। লেনিন বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে বুর্জোয়া রাজনীতি প্রায় পুরোটাই অর্থ-বিত্ত, প্রচার, পেশি ও প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক দখলীকরণের প্রক্রিয়ায় কর্পোরেট অর্থনীতির আদলে কর্পোরেট রাজনীতির রূপ পরিগ্রহ করলো। অর্থাৎ জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকার বদলে তা অন্যের হাতে তুলে দেয়ার অনুমোদনের জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে গেল। কমরেড লেনিন বলেছিলেন, এ কালের নির্বাচন ব্যবস্থা বুর্জোয়া শোষক শ্রেণির কোন অংশ জনগণের উপর শাসন-শোষণ চালাবে তার অনুমোদন দেয়ার উপায়ে পরিণত হয়েছে। জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার ধনিক শ্রেণির ইচ্ছার খাঁচায় বন্দি হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে অধিকার কতোটা অবমুক্ত হবে তা নির্ভর করে শাসক দলের আপাত: স্বার্থ পূরণে বা ধনিকশ্রেণির শ্রেণিগত প্রয়োজনে কিংবা শক্তিশালী গণআন্দোলনের চাপের শক্তির উপর। গণআন্দোলনের ব্যাপ্তি, শাসন ক্ষমতার বদল কিংবা পুরো ব্যবস্থা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার পরিমাণ ও গুণ নির্ধারিত হয়। শোষণ বৈষম্য সৃষ্টিকারী সমাজ ও স্বৈরশাসনে জনগণের জন্মগত অধিকারের স্বীকৃতি মান্য হওয়ার নয়। এই পরিস্থিতিতে আজ গোটা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দুনিয়া গণতান্ত্রিক শাসন সংকটে রয়েছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে গণতন্ত্রের প্রাণসত্তা মুমূর্ষু দশায় পতিত হলেও তারা নির্বাচনের মহড়ায় নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ধরে রাখতে ও প্রচারের ভুবনে অতি দক্ষতায় গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন করে চলার সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারছে। সারা বিশ্বে লুটতরাজ চালিয়ে

Scanned with CamScanner

নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারছে। কিন্তু আমাদের দেশসহ অনুন্নত পশ্চাদপদ দেশসমূহে শাসন ব্যবস্থার সংকট বিশেষ করে জনআকাঙ্খা পূরণের উপযোগী শাসন-প্রশাসন ও ক্ষমতাবদলের প্রক্রিয়ার নির্বাচন কোনটাই স্বচ্ছ, গ্রহণযোগ্য, সংঘাতমুক্ত রাখতে পারছে না। সত্যের খোলসে মিথ্যা ঢেকে রাখতে পারছে না। তবে প্রতিকারহীন অন্যায়কে সহনীয় করে ফেলার কাজে অনেকটা সফলতা লাভ করেছে। সেই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার ৪৮তম বছরে হতে যাচ্ছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

অতীত অভিজ্ঞতা কি বলে?

দশটি সংসদের মেয়াদকালে অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ সময় মিলে যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছে, যে পথে রাজনীতি এগিয়েছে তা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে শুধু নয়, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাযোগ্যতায়, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতায়, অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচন করার সামর্থও আমাদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণি হারিয়ে ফেলেছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম সংসদ নির্বাচনে একতরফা ভোটারবিহীন নির্বাচনে যার চরম প্রকাশ ঘটেছে। অতীত সংসদ নির্বাচনের কোনটিতেই সংসদ কার্যকর করা যায়নি। সংসদে অনুপস্থিতি, কোরাম সংকট, নেতৃত্বের তোষামোদ, অতিকথন, বাচাল বিতর্ক, হাততোলা সমর্থন কিংবা তদনুরূপ বিরোধিতায় সময় গেছে। দশম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, কোরাম সংকটে ১২% সময় নষ্ট হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য ১২৫ কোটি টাকা অথচ সাংসদদের প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা, সেক্ষেত্রে ব্যয় করেছেন মাত্র ৯% সময়। মহামান্য, মহামান্য রব অবিরাম ধ্বনিত হলেও মালিক জনগণ এখনও মহামান্য হয়ে উঠতে পারেননি, সামান্যই থেকে গেছেন। পার্লামেন্ট তথা আইনসভার সদস্যদের নতুন আইন প্রণয়ন কিংবা পুরাতন আইনের আইনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে কতোটা তা জনস্বার্থে, গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে ও সম্প্রসারণে কাজে লাগছে কিংবা গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার সংকোচনে ব্যবহৃত হচ্ছে তা নিয়ে তাদের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে, বাস্তবায়নে বা লংঘনে তাদের করণীয় দায়িত্ব পালন করতেও তেমন দেখা যায়নি। তারা নির্বাচনী এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রকল্প বরাদ্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ইত্যাদি নিয়েই সরব এবং ব্যস্ত ছিলেন যা তাদের কাজ ছিলনা। স্থানীয় সরকার (শাসন) কাঠামো এখনও তেমন একটা দাঁড়ায়নি, তারপরও যতটুকু ক্রিয়াশীল করা যেত তা সাংসদদের হস্তক্ষেপে, আমলা প্রশাসনের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভের পরিবর্তে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি দল নির্ভর আমলাতান্ত্রিক চক্রে পরিণতি পেয়েছে। প্রতিনিধিত্বমূলক সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা ছাড়া এ পরিবেশ পরিস্থিতি পাল্টানো যাবেনা-দাবি থাকার পরও তা কানে তোলা হয়নি। স্থানীয় সরকারের নামে বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্প্রসারিত বাহু যেভাবে ছড়ানো হয়েছে তাকে সত্যিকার গণপ্রতিনিধিত্বশীল করার কাজেও হাত দেয়া হয়নি। ফলে কথিত স্থানীয় সরকারের এই সব গণপ্রতিনিধি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয় আর

Scanned with CamScanner

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আদেশে নির্দেশে বরখাস্ত হয়। সরকারি কর্মচারীর চেয়েও এদের অবস্থা অনেক বেশি নাজুক।

১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছিল। সর্বশেষ ২০১৪ সালে দশম নির্বাচনে বিনা ভোটে ১৫৪ জন সাংসদ নির্বাচিত হয়ে পাঁচ বছর পার করে সংসদ ও মন্ত্রীসভা বহাল রেখে অর্থাৎ দলীয় সরকারের অধীনেই ২০১৮ সালের শেষ সময় ৩০ ডিসেম্বর একাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। স্বাধীনতাত্তোর প্রথম নির্বাচন থেকেই জাল-জালিয়াতি, সূক্ষ্ম কারচুপি, জয়ী প্রার্থীকে হারানো, হেরে যাওয়া প্রার্থী জেতানো, অঢেল টাকার লেনদেন, পেশি শক্তির মহড়া, ভোট কেন্দ্র দখল করা, আমলা-পুলিশ ইত্যাদিকে হাত করা, প্রশাসন ও কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রকে বশে রাখা, ফলাফল ঘোষণায় অস্বচ্ছতা ইত্যাদি হয়ে এসেছে। দিনে দিনে কৌশল পাল্টেছে, এনালগ ডিজিটাল হয়েছে, মাত্রা বেড়েছে। এই সময়কালে ১৯৭৫ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সপরিবারে নিজ বাসভবনে ও ১৯৮১ সালে আরেক রাষ্ট্রপতি চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে সামরিক অভ্যুত্থানে খুন হয়েছেন। কারাগারে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী ৪ জাতীয় নেতা খুন হয়েছেন। অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সামরিক কর্মকর্তাসহ বহু সৈনিক হত্যার শিকার হয়েছেন। ধর্মীয় ও জাতিসত্ত্বাগত সংখ্যালঘুরা ক্রমাগত নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, দেশ ছাড়া, জমি-ভিটা হারা হয়েছেন। ৫০০ স্থানে একযোগে ধর্মীয় মৌলবাদীগোষ্ঠী বোমা ফাটিয়েছে, মুক্ত চিন্তার বহু মানুষ খুন হয়েছে, প্রকাশ্য জনসভায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গ্রেনেড, বোমা হামলা হয়েছে, ২ বার প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন, ১ বার পরোক্ষ সামরিক শাসন, ১৯৭১ ও ১৯৯০ এর পরাজিত ও গণবিরোধী শক্তির পুনর্বাসন, ৫ বার জরুরি অবস্থা, ১৮/১৯ দফা ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান, বিডিআর বিদ্রোহ, আনছার বিদ্রোহ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও বাতিল, পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা, একদলীয় ব্যবস্থা, দ্বি-দলীয় ভিত্তিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা, একদল নিয়ন্ত্রিত পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা ইত্যাদি দোল খেয়ে চলা অব্যাহত রয়েছে। কোন ব্যবস্থাই আজো টেকসই হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করেনি।

সংবিধানকে গোঁজামিলের দলিল ও স্বৈরশাসনের হাতিয়ার বানানো হয়েছে

১৯৭২ সালে রচিত সংবিধানে কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল যা দূরীকরণের বদলে ১৭টি সংশোধনীর মাধ্যমে কাটাছেড়া করে সংবিধানকে একটা গোঁজামিলের দলিলে পরিণত করা হয়েছে। দু-একটি বাদ দিলে সবকটি সংশোধনী শাসকশ্রেণির প্রয়োজন ও সুবিধা স্বার্থে করা হয়েছে। সামরিক স্বৈরশাসনের স্থলে বেসামরিক স্বৈরশাসনকে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ও অঙ্গীকারসমূহকে সাইনবোর্ড সাজিয়ে রেখে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কায়কারবার চালানো হয়েছে এবং হচ্ছে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এর ঘোষণা দিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, স্বাধীন বাংলদেশে সেই সাম্যবাণী অর্থহীন প্রলাপে পরিণত হয়ে

Scanned with CamScanner

বৈষম্যের পাহাড় তৈরি করেছে। পাকিস্তানী ২২ পরিবারের স্থলে ৭০ হাজার কোটিপতি পরিবার গজিয়েছে। শান্তিপ্রিয়, সৎ, দেশপ্রেমিক, আদর্শবান মানুষদের মান সম্মান নিয়ে টিকে থাকাকে দুষ্কর করা হয়েছে। শোষণ বৈষম্যের শিকার হয়ে মানুষ যতো বেশি দরিদ্র ততো বেশি পদে পদে অসম্মানিত, অমূল্যায়িত। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ, জাতিগত সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া, নারী শিশুদের আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটানো চলছে প্রতিকারহীনভাবে। সাধারণ মানুষের মানবিক মর্যাদা এখন লুটপাটকারী বিত্তবান ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর মিথ্যা মর্যাদার কাছে পরাভূত। পুঁজিবাদী আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদীতায় সামাজিক বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলা হয়েছে। ফলে অনাচার অবিচার সকল মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে গ্রাস করে ফেলেছে। ধনিকশ্রেণির জন্য বিচার আর দরিদ্রশ্রেণির জন্য বিচার পৃথক সীমানায় ভাগ হয়ে গেছে। তাই বলা হয়ে থাকে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। সংবিধানে বর্ণিত অঙ্গীকারনামায় জনগণের ক্ষমতায়নের অর্থে গণতন্ত্র এখন গণ উপহাসতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। স্বৈরতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের বাইরে তার অস্তিত্ব মেলা ভার। শোষণহীন সমাজ নির্মাণের অর্থে সমাজতন্ত্র এখন মুক্তবাজারি লুটপাটতন্ত্রের উদরে ঢুকে গেছে। ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস পালনের স্বাধীনতায় রেখে রাষ্ট্র ও সমাজকে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার করার ঘোষণা এতটাই অকার্যকর যে রাষ্ট্রের কপালে বিসমিল্লাহ খচিত রাষ্ট্রধর্মের সাইনবোর্ড ঝুলছে। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার অতি নিম্নগামী নিকৃষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে যার এখন কোন রাখঢাক নেই। স্বাধীন জাতীয় বিকাশ ও জাতীয় মর্যাদার জাতীয়তাবাদ এখন সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির কোন না কোন অংশের কাছে নতজানু। জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ওদের মদদ পাওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে।

মুষ্টিমেয় মানুষের উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন বলে চালানো হচ্ছে

মুষ্টিমেয় মানুষের উন্নতি-উন্নয়নকে দেশের উন্নয়ন বলে ঢাক পেটানো হচ্ছে। সার্বিক অর্থব্যবস্থার অন্তর্গত, অন্তর্নিহিত কাঠামোগত ভিত্তিমূলে টেকসই সামর্থ সৃষ্টির চেয়েও অবকাঠামোগত দৃশ্যমান উন্নতি দেখানোর প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখাতে টাকা ঢালছে যতো দুর্নীতি-আত্মসাৎ বাড়ছে ততো। কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রায় ৬০ ভাগ পর্যন্ত অপচয়ে লুটতরাজে চলে যাচ্ছে। ফলে ইটপাথর, রড-সিমেন্টের সৌধ সেতু সড়ক যত দৃশ্যমান হচ্ছে তার কয়েকগুণ বেশি দৃশ্য অদৃশ্য দুর্নীতি প্রসারিত হয়েছে, যার সামান্য কিছু নমুনা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে সরকারি দলের সাংসদ-মন্ত্রী এমন প্রার্থীদের হলফনামায় দেখা যাচ্ছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল অংশের বিশেষ করে ক্ষমতাবলয়ের সাথে ঘনিষ্ঠদের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ পরিমাপ করলে দেখা যাবে রাষ্ট্রের ওজনের চেয়ে তাদের সম্পদের ওজন বেশি। যে কারণে হয়তো অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, 'এখন পুকুর চুরি নয়, সাগর চুরি হচ্ছে'। দুর্নীতির অর্থ সম্পদকে দেশীয় সীমানায় আটকানো যায়নি। সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে, মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় বাড়িঘরে, কানাডার বেগম

Scanned with CamScanner

পাড়ায়, সিঙ্গাপুরে ধন প্রতিযোগিতায়, আমেরিকায়-লন্ডনে গরীব দেশের ধনীরা তাক লাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

কাজেই উন্নয়ন উন্নয়ন বলে কিছু নজরকাড়া স্থাপনার দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেই প্রকৃত উন্নতির স্বরূপ বুঝা যায় না। উন্নয়ন কাদের দ্বারা, কাদের জন্য হচ্ছে, উন্নয়নের দর্শন কী, উন্নয়নের গুণমান ও গতি প্রকৃতি কি মাপে কোন দিকে ধাবিত, উন্নয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের আশু প্রভাব ও সুদূর প্রসারী কার্যকারিতা কতটুকু ইত্যাদি বিষয়গুলোর বিচার বিশ্লেষণ দরকার। সেই বিচারে পুঁজিবাদী বাস্তবতায় শেষ পর্যন্ত তা ধনিকশ্রেণির উন্নয়ন ঘটায় আর এই শ্রেণির ভোগ তৃপ্তির উদ্বৃত্ত অংশটা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যে জোটে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) খানা আয় জরীপে ২০১০-২০১৬ সবচেয়ে ধনী ৫% পরিবারের আয় ৫৭% বেড়েছে। তাদের মাসিক আয় ৮৮ হাজার ৯ শ ৪১ টাকা। সবচেয়ে দরিদ্র ৫% এর আয় কমেছে ৫৯%। তাদের মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে ৭৩৩ টাকায়। ২০১০ এ ছিল ১৭৯১ টাকা। (প্রথম আলো ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নতির সাথে দুর্নীতির একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ থাকে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে দুর্নীতির লাগাম টেনে রাখার একটা আইনি ব্যবস্থা ও চেষ্টা থাকে। আমাদের দেশে আইনি তেমন লাগাম নেই, চেষ্টাও সীমিত।

আমাদের বস্তুগত উন্নয়নকে আমাদের দেশের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্টের সাথে সংগতিপূর্ণ করা হয়নি। নদীকে কেন্দ্র করে আমাদের জনবসতি, হাট-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র, যাতায়াত-যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প, পরিবেশ, প্রাণপ্রকৃতি গড়ে উঠেছিল। নদী বাহিত পলি দিয়েই বাংলাদেশ নামক বদ্বীপটি গঠিত। সেজন্য একে নদীমাতৃক দেশ বলা হয়। কিন্তু অপরিকল্পিত, ভ্রান্ত পরিকল্পনায় বাংলাদেশকে সেতু-সড়কমাত্রিক দেশে পরিণত করা হয়েছে। আমাদের প্রধান গুরুত্বে থাকার কথা ছিল নাব্যতা বজায় রেখে নৌপথ, দ্বিতীয় গণপরিবহনের আধুনিক রেলব্যবস্থা ও রেলপথ, তৃতীয় স্থানে পরিবেশ বান্ধব সড়ক পথ। কিন্তু সড়ককে এক নম্বরে আনা হয়েছে ব্যয়বহুল, অধিক ঝুঁকি ও স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থা বিনষ্ট করে। মাল পরিবহন ও গণপরিবহনের জন্য নৌপথ ও রেলপথকে প্রাধান্যে রেখে পরিপূরক হিসাবে সড়ক পথ বিন্যস্ত করা গেলে নগণ্য ঝুঁকি, সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব করে ঘনবসতিপূর্ণ দেশের চাহিদা পূরণ করা যেত। আকাশ পথের যাতায়াতকেও এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে আরও সুফল আনা যেত। অতীতকালে এই ভূখণ্ডে ১২০০ নদীর নাম জানা যেত। এখন ২৩০টিও টিকে থাকতে পারছে না। ভারত হয়ে ৫৪টি এবং মিয়ানমার থেকে ৩টি মোট ৫৭টি নদী বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। ভারত একতরফাভাবে উজানে অধিকাংশ নদ-নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি প্রত্যাহার করে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ, নদীর স্বাস্থ্য, পরিবেশ, প্রাণবৈচিত্র্য, অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার উপর বিরূপ প্রভাব প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে চলেছে। অন্যদিকে ক্ষমতার প্রশ্রয়ে দেশীয় প্রভাবশালী লুটেরা গোষ্ঠী নদী, খাল,

Scanned with CamScanner

জলাশয় দখল করে এবং কারখানার রাসায়নিক বর্জ্যসহ নানা প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা ফেলে পানি দূষিত করছে নিত্যদিন। ঢাকা শহরেই ৫৬টি খালের মধ্যে মাত্র ২৬টি কোনভাবে টিকে আছে। এই রাজধানী শহরের চারপাশে ৪টি নদী দখল ও চরম দূষণের শিকার। অথচ শাসকদের প্রতিকার ভাবনা উল্টো দিকেই চলছে। যেমন ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (DAP) ৮ বছরে ১৫৮ বার সংশোধনী এনেছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রীসভা কমিটি। .... ৩৪টি সংশোধনীর মাধ্যমে জলাশয় ভরাট ও ১৪ সংশোধনীর মাধ্যমে বন্যা প্রবাহ এলাকা ভরাটের অনুমতি দিয়েছে মন্ত্রীসভা কমিটি। (প্রথম আলো ২৩ এপ্রিল ২০১৮)

স্বাভাবিক ব্যয়বৃদ্ধির উন্নয়ন সাধারণ জনগণের জীবনমানকে ব্যয়বহুল ও দুর্বিষহ করে তোলে। বিশ্বব্যাংক সমীক্ষা থেকে জানা যায় জমি অধিগ্রহণসহ ৪ লেন প্রতি কি. মি. সড়ক করতে ভারতে খরচ হয় ১১ লাখ থেকে ১৩ লাখ ডলার, চীনে লাগে ১৩ লাখ থেকে ১৬ লাখ ডলার, ইউরোপে ৩৫ লাখ ডলার (২ লেন থেকে ৪ লেন করতে লাগে ২৫ লাখ ডলার)। অথচ ঢাকা-মাওয়া ৪ লেন প্রতি কি. মি. সড়কে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ১৯ লাখ ডলার। (প্রথম আলো ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮) উন্নয়নের গুণমান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বৃটিশ আমলের করা অনেক দালান স্থাপনা এখনও স্বমহিমায় খাড়া হয়ে আছে। অথচ 'এক বছর না হতেই ঢাকা কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারের পলেস্তারা খসে পড়েছে। কয়েকটি ভবনের দরজা জানালা বেঁকে গেছে। ভেঙে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি। মহাপরিদর্শক বললেন, নির্মাণ কাজ নিম্নমানের।' (প্রথম আলো ২৯ জুলাই ২০১৮) অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকারের দেওয়া লাল-সবুজ রঙের বাড়ি 'বীর নিবাস' সারাদেশে ২ হাজার ৭ শত ২০টি একতলা বাড়ি বানানোর উদ্যোগ নেয় সরকার। মাদারীপুরে ৩১টি ভবন হস্তান্তরের কয়েক মাসের মধ্যেই ফাটল দেখা দিয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ৯৪টি পাকা বাসস্থান ৪ বছরের মধ্যেই অধিকাংশ বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে।' (প্রথম আলো ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮) দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য 'বীর নিবাস', আর সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় বিচারাধীন অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রাপ্তদের বাস করার কারাগার দুটির অবস্থানই জানান দেয় বাকি ক্ষেত্রে কি চলছে।

উন্নয়ন প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সমীক্ষা, নানামুখী পর্যালোচনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুত্ব কতো কম থাকে তা বুঝা যাবে, ৪ নভেম্বর একনেক বৈঠক ৩টা থেকে ৭-৩০ মি: (২৪০ মিনিট) চলে। এর মধ্যেই ৮৬ হাজার ৬ শত ৮৭ কোটি টাকার ৩৯টি প্রকল্প পাশ হয়। ৬ মিনিটে ১টি করে প্রকল্প পাস হয়। অনেক প্রকল্পের সমীক্ষা হয়নি। (কালের কণ্ঠ ৫ নভেম্বর ২০১৮) এই ধরনের উন্নয়নে সাম্য সমতামূলক সমৃদ্ধির বদলে বৈষম্য বৃদ্ধি ঘটে। এই বৈষম্য সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে। মানবিকতা, মূল্যবোধ, নীতি নৈতিকতা ও সুস্থ শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে। অপরাধ প্রবণতা, আত্মহত্যা প্রবণতা, মানসিক বিকারগ্রস্ততা ইত্যাদি ভাবগত তথা মনোজগতের সৃষ্টিশীলতায় বন্ধাত্ব নিয়ে আসে।

Scanned with CamScanner

আয় কার রক্ত ঘামে আর ভোগ দখল কার উল্লাসে বিলাসে!

একদিকে ১ কোটি প্রবাসী শ্রমিক, গার্মেন্টসসহ দেশের শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষক এই তিন স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে দেশ আয় করছে, বৈদেশিক মুদ্রা আনছে আর স্বয়ম্ভর হচ্ছে খাদ্যে। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় একটা গোষ্ঠী ক্ষমতার জোরে সম্পদ দখল করছে দেশে, পাচার করছে বিদেশে। আমেরিকা ভিত্তিক গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি (GFI) বলছে, নয় বছরে বিদেশে পাচার হয়েছে সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফরাসউদ্দিন বলেছেন, ২০১৩ সালে ১ বছরে প্রায় ৭২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। আমদানী রপ্তানির ওভার ইনভয়েচিং আন্ডার ইনভয়েচিং মারপ্যাচে বিপুল অর্থ যাচ্ছে প্রতি নিয়ত। দেশে কোন্ আর্থিক বিবেচনায় ৫৯টি ব্যাংক রয়েছে তা বুঝা কঠিন। বর্তমান সরকারের ১০ বছর ক্ষমতার মেয়াদকালে ১১টি ব্যাংক এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর ভাষ্য মতে রাজনৈতিক বিবেচনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাজ করেছে। ব্যাংক ঋণের নামে ব্যাংক লুট হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। খেলাপী ঋণ ২০০৯ সালে ছিল ২২হাজার ৪ শত ৮১ কোটি টাকা, ২০১৮ তে তা দাঁড়িয়েছে ৯৯ হাজার ৩ শত ৭০ কোটি টাকা। এর সাথে অবলোপন হয়েছে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। মোট ১ লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকা। একদিকে রাষ্ট্রক্ষমতার সাথে ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালীরা লুট করছে, অন্যদিকে জনগণের টাকায় তা পূণর্ভরন করা হচ্ছে। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ১০ হাজার ২ শত ৭২ কোটি টাকা জনগণের পকেট কেটে পুনর্ভরন করা হয়েছে। তারপরও মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ২২ হাজার কোটি টাকার মূলধন ঘাটতি থেকে গেছে। (D-star, 29 Nov 2018)। 'গত দশ বছরে জনতা ব্যাংক থেকে অ্যানটেক্স, ক্রিসেন্ট ও থারমেক্স গ্রুপ মিলে ১১ হাজার ২ শত ৩০ কোটি টাকা হাতিয়েছে। বেসিক ব্যাংক থেকে বের হয়ে গেছে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা। সোনালী ব্যাংক থেকে হলমার্ক নিয়ে গেছে ৩ হাজার ৫ শত ৪৭ কোটি টাকা। বিসমিল্লাহ গ্রুপ নিয়েছে ১ হাজার ১ শত ৭৪ কোটি টাকা। এ ছাড়াও রিজার্ভ চুরির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে হারিয়েছে ৬ শত ৭৯ কোটি টাকা। নতুন প্রজন্মের এনআরবি কমার্সিয়াল ও ফারমার্স ব্যাংক থেকে লোপাট হয়েছে ১ হজার ২ শত ১ কোটি টাকা। এবি ব্যাংক থেকে পাচার হয়েছে ১ শত ৬৫ কোটি টাকা। ব্যাংক খাতের এই ১০টি বড় কেলেঙ্কারিতে লোপাট হওয়া ২২ হাজার ৫ শত ২ কোটি টাকা দিয়ে পদ্মা সেতু নির্মাণের ৭৮ শতাংশ... সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে প্রায় ৪১ শতাংশ টাকার জোগান দেওয়া সম্ভব ছিল (CPD) ' (প্রথম আলো ৯ ডিসেম্বর ২০১৮)। অর্থমন্ত্রী বেসিক ব্যাংক এর চেয়ারম্যান আ. হাই বাচ্চু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'বেসিক ব্যাংকের সবকিছুতেই তার কাজকর্ম ছিল প্রায় ডাকাতের মত, ঘটনাতো আর একটা না।' (প্রথম আলো ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭) সংসদীয় কমিটির বৈঠকে কমিটির সভাপতি আ. রাজ্জাক বলেছিলেন, 'বেসিক ব্যাংক থেকে ২ হাজার ৯ শত কোটি টাকা ৭০/৮০ জন লোক

Scanned with CamScanner

নিয়ে গেল।...ডাকাতির চেয়েও বড় কিছু হয়েছে। চেয়াম্যানের দুর্নীতির প্রমাণসহ দুদকে উপস্থাপন করলেও সংস্থাটি আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়নি।' (প্রথম আলো ২৭ আগস্ট ২০১৭) ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সুইফট এর মাধ্যমে ডলার চুরির সুরাহা এখনও হয়নি। শেয়ার বাজারের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাটের ব্যাপারে ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি, এমনকি উভয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্ণর ও সাবেক গভর্ণর এর নেতৃত্বে গঠিত দুটি তদন্ত কমিটির তদন্ত রিপোর্টও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে, নীতি মূল্যবোধ ধ্বসে যাচ্ছে

আর্থিক অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, লুটপাট ও নিয়মিত শোষণের ফলে বৈষম্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্টসহ সকল ক্ষেত্রে অরাজকতা, উদ্দেশ্যহীন বেপরোয়া মনোভাব বাড়ছে, মানবিক মূল্যবোধগুলো ধ্বসে পড়ছে, বাড়ছে আত্মহত্যা ও মাদকাশক্তি। প্রায় ১০ হাজার তরুণ তরুণী আত্মহত্যা করছে প্রতিবছর। প্রায় ৮০ লাখ মাদকাশক্ত। এর ৯১% তরুণ-তরুণী। ফলে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আজ দিশাহীন। বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর ও ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। শাসন প্রশাসন কাঠামোকে জনগণের ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র ও সুশাসনের বিপরীত মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, আমলাতন্ত্র, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে শুরু করে সকল প্রথা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে গণতান্ত্রিক আইনানুগ ছাঁচে না ফেলে স্বেচ্ছাচারী শাসন পরিচালনা উপযোগী করে ফেলা হয়েছে। যে রাষ্ট্রপতি দু'টি কাজের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বাইরে কোন কাজ করতে পারে না, সেই রাষ্ট্রপতির হাতে সাংবিধানিক ও অপরাপর প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃত্ব সঁপে দিয়ে আর যাই হোক সুশাসন, গণতান্ত্রিক শাসন, আইনের শাসন কোনটাই প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। এমনিতেই নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনসভার ভারসাম্যমূলক স্বাতন্ত্র ক্ষুন্ন করে নির্বাহী কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে যুক্তিসঙ্গত আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ বর্জিত ক্ষমতাকেন্দ্র যতো শক্তিশালী হয়ে উঠছে ততোই প্রথা প্রতিষ্ঠানগুলি স্বেচ্ছাচার-স্বৈরাচার অনুগামী হয়ে পড়ছে। আবার প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা যতো হারাচ্ছে ততোই ব্যক্তি গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থ মাথা চাড়া দিচ্ছে এবং তা বাস্তবায়নে তারা ক্ষমতাকেন্দ্রকে আরও শক্তি যুগিয়ে স্বার্থ-সুবিধা হাসিল করতে পারছে। অথচ একটা সময় গেছে যখন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো আপেক্ষিক অর্থে নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র বজায় রেখে চলতো তখন শাসন ক্ষমতার পরিবর্তনে তাদের ক্ষতি বৃদ্ধির কিংবা ঝুঁকি-নিরাপত্তার তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু বহুদিনের সামরিক-অসামরিক স্বৈরাচারী শাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রশাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকর্তাদের একটা বড় অংশ শাসকশ্রেণির ভাগ্যের সাথে তাদের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ স্বার্থ সিদ্ধির রজ্জু উভয়ে উভয়ের সাথে বেঁধে নিয়েছে। ফলে ভ্রষ্ট পথে পরিচালিত দুর্বৃত্তায়িত দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনৈতিক শক্তিকে টিকিয়ে রাখার কাজে

Scanned with CamScanner

এরা ব্যবহৃত কিংবা সমর্পিত হচ্ছে। এটা নির্বাচনে জনমতের সাধারণ প্রতিফলন ঘটানোর সামনে একটা বড় বাধা। তবে যদি বিপরীতমুখী আন্দোলনের স্রোত বাঁধভাঙা জোয়ারের সম্ভাবনা নিয়ে এগুতে থাকে তখন এই ব্যবস্থা বিন্যাস পাল্টেও যেতে পারে। সেটা এখনও দৃশ্যমান হচ্ছে না।

মতপথ নিয়ে বিতর্কের ঝড় নির্বাচনকে অর্থবহ করতে পারে

সকল গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সেই লক্ষ্যে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য জরুরি। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক শাসনের পটভূমি গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরে ব্যাপক সুস্থ রাজনৈতিক তর্ক বিতর্কের ঝড় তোলা প্রয়োজন। শাসন-প্রশাসন, আইন-কানুন, বিধি-বিধান, বিগত দিনের শাসন, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার ঘাটতি, দুর্নীতি-দুঃশাসন, জনস্বার্থে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে দুর্বলতা ইত্যাদি নিয়ে যুক্তিনির্ভর আলোচনা-পর্যালোচনা-সমালোচনা যত গভীর ও নানামুখে বিস্তৃতি লাভ করবে ততোই জনগণের সচেতনতা বাড়বে, ভোটার এবং ভোট প্রার্থী, ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রার্থী উভয়েই রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। মতাদর্শিক, বাস্তববাদী জীবন চাহিদা কেন্দ্রিক ও যুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্তে গরিষ্ঠতা এবং লঘিষ্ঠতা নির্ণীত হবে। টাকা, পেশিশক্তি, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, অন্ধত্ব-উগ্রতার বিভাজন প্রক্রিয়া ও প্রভাব কমিয়ে আনা যাবে। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়টিকেও মনযোগ দিয়ে দেখতে হয়। গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাকেও সেক্যুলার গণতান্ত্রিক নীতি পদ্ধতির উপর দাঁড় করাতে হয়। শিক্ষাকে সামন্ত চিন্তার সাথে সমন্বয় করে রেখে গণতান্ত্রিক শিক্ষার স্তরে উন্নীত করা সম্ভব নয়। কারণ বিজ্ঞান এবং কুসংস্কার হাত ধরাধরি করে চলতে পারে না। সকল মানুষের জন্য শিক্ষার দ্বার অবারিত করতে না পারলে শিক্ষা যেমন গণতান্ত্রিক হয় না তেমনি শাসনব্যবস্থাকেও গণতান্ত্রিক করা সহজ হয় না। টাকা যার শিক্ষা তার; টাকা যার চিকিৎসা তার - এই নীতিতে বিত্তবান শ্রেণির শাসনতন্ত্র হয়, জনগণের শাসনের গণতন্ত্র হয় না। রাষ্ট্র দায়িত্ব না নিয়ে দরিদ্র মানুষদের সন্তানদের এতিমখানা-মাদ্রাসা-মক্তবে ঠেলে দিয়ে, শিশু শ্রমে বাধ্য করে আর বিত্তবানদের সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে কিংবা দেশে অতি উচ্চ মূল্যের ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা দিয়ে এবং আম জনতার জন্য সাধারণ শিক্ষাকে অতি সাধারণ মানে নামিয়ে সমাজ মননে গণতান্ত্রিক চেতনার বীজ অঙ্কুরিত করা যায় না।

নির্বাচন পরিবেশ

আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচনে অতীত ধারাবাহিকতার সংঙ্গে পূর্ণ ছেদ ঘটিয়ে নির্বাচন কমিশন একটা উন্মুক্ত আস্থাভাজন, শঙ্কামুক্ত পরিবেশ এখনও রচনা করতে পারেনি। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা মুক্ত পরিবেশ তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন হলে তাদের পরাজয় সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত কিন্তু তা মেনে নেওয়া তাদের সাধ্যের অতীত। তাছাড়া দশম নির্বাচনের মোহ এবং

Scanned with CamScanner

নেশা কাটিয়ে উঠতেও তাদের বেগ পেতে হচ্ছে। বাইরের শক্তির কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর ঠাঁই এখন হুবহু আগের মতো নেই। তাছাড়া নতুন বিরোধী জোটগত শক্তি বিন্যাস ও তাদের পরিবর্তিত চেহারা শাসক দলের রাজনৈতিক আদর্শিক আক্রমণের হাতিয়ারের ধার বেশ কমিয়েছে। সরকার সম্পর্কে জনগণের মনোভাব বিপরীত দিকে এতটাই শক্তভাবে বেঁকে গেছে যে হাতুড়ি পিটিয়েও তা বাগে আনা যাচ্ছে না। আবার সরকারি সাজানো বাগানের পাতানো ছকে নির্বাচন কতোটা গ্রহণযোগ্যতা পাবে তাও পরিমাপ করা কঠিন। কারণ সকলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের কৃতিত্ব আর বিশ্বাসযোগ্যতায় সুষ্ঠভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার মানদণ্ড এক সমীকরনে সবসময় আনা যায় না। এর অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান বাস্তবতার নানামুখী ঘাত প্রতিঘাতের দিক রয়েছে। তারপরও সেদিকেই এগুচ্ছে সরকার। প্রধান বিরোধী শিবির হামলা মামলায় পর্যুদস্ত। এক্ষেত্রে সহানুভুতি লাভ আর সরকার বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি তাদের পুঁজি। নতুন মোড়কে ঐক্যের সাজ তাদের অন্যতম আকর্ষণ। স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতকে দূরে ঠেলে সঙ্গে রাখার কৌশল খুব কাজে না আসলেও আওয়ামী জোট শিবিরে ধর্মবাদী দলের সংখ্যাধিক্য ও আওয়ামী লীগের হেফাজতে ইসলামের সান্নিধ্য বিএনপির কালিমা অনেকটা মুছতে কিংবা সমানে সমান বিতর্কে আসতে সহায়তা করেছে। তবে দেশপ্রেম, সেক্যুলার গণতন্ত্রের কথা বলে জোটে শরীক হওয়া দল ও ব্যক্তিদের অস্বস্তি কমেনি। ক্ষমতাসীন দলের এবারের নির্বাচনী ছক কেমন হবে তা তাদের চট্টগ্রাম ১৫ আসনের সাংসদ এবং বর্তমান প্রার্থী যেমন বলেছিলেন যে, 'আমি আবার নির্বাচিত হলে আমরা সবাই ভাগ করে, বাটোয়ারা করে খাবো ইনশাল্লাহ' (প্রথম আলো ৪ ডিসেম্বর ২০১৮)। তেমনি মডেলে নির্বাচনের শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন দল। তবে দলীয় আভ্যন্তরীণ প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি সহ জোট সঙ্গীদের অসন্তোষ ইত্যাদি মিলে সার্বিক পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারলে নির্বাচনের কি হাল দাঁড়াবে, দেশের পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াবে তা এখনই স্পষ্ট করা সম্ভব নয়। বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, আমলা-প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, দুদক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান আস্থা কুড়ানোর বদলে আস্থা হারানোর দিকেই ঝুকছে বেশি। বিশেষ করে নির্বাচন কমিশন। এমনিতেই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর দৃষ্টান্ত বিরল। নির্বাচনকালীন সময়ে বাস্তবে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠানটি মুখ্য ভূমিকায় থাকার কথা। যদিও বর্তমান নির্বাচন কমিশনের উপর দৃশ্যমান বাহ্যিক চাপের পরিমাপ সঠিকভাবে করা না গেলেও কমিশনের আভ্যন্তরীণ সামর্থ-সংহতি যে দুর্বল ও নড়বড়ে তা বোঝা যায়। এবার নির্বাচন কমিশন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশ কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে ডেকেছিলেন। সে বৈঠকে একজন কমিশনার একটি লিখিত বক্তব্য পেশ করেন যা সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। তা ছিল কমিশনার মাহবুবুর তালুকদার এর বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে একক দায়িত্বে থাকার অভিজ্ঞতা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের স্বরূপ সন্ধান এর উপর ৭১ পৃষ্ঠার তদন্ত রিপোর্টের অংশ বিশেষ। সেখানে তিনি বলেন, "কোন

Scanned with CamScanner

কোন ক্ষেত্রে বিরোধী প্রার্থীদের পুলিশ কর্তৃক অযাচিতভাবে হয়রানি করা হয়েছে। আবার সরকারি দলের প্রার্থীর আচরণ বিধি ভঙ্গের ঘটনায় পুলিশকে নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেছে। শুধু তাই নয় উল্টো বিরোধী প্রার্থীর প্রচার প্রচারণায় পুলিশের অযাচিত হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে।' যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল তার বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন অনেক ক্ষেত্রেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল না এবং ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার এ বিষয়ে আন্তরিক ছিলেন না। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক ও সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নিরাপত্তায় কোন পুলিশ সদস্য নিয়োগ দেননি।' ভোট কেন্দ্রসহ নির্বাচনী এলাকার অনেকক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল নাজুক। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তার নির্দেশনা অনুসরণ করেননি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভোট কেন্দ্রে ও ভোট কেন্দ্রের বাইরে প্রচুর বহিরাগতদের অবস্থান ছিল।' তিনি উল্লেখ করেন, '২০১৬ সালের ২৪ মে বাংলাদেশ সরকার বনাম ব্লাস্ট এর মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় আপিল বিভাগ "গাইড লাইন ফর ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস" শিরোনামে গ্রেপ্তার সম্পর্কে যে নির্দেশনাটি প্রদান করেছেন তা কোথাও যথাযোগ্যভাবে পরিপালন করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।' তিনি বলেন, 'বরিশাল ৫ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ছিল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্নমুখী অনিয়ম শুরু হয়। বেলা ১১টার মধ্যে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়, এভাবে ভোট গ্রহণ চলতে পারে না। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনারকে আমি জানাই, বরিশালের ভোট কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন। এক পর্যায়ে কমিশনারদের সবাই ভোট বন্ধ করার বিষয়ে একমত হলেও নির্বাচন বন্ধ করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে কিনা, ভেবে নির্বাচন বন্ধ করা থেকে আমরা বিরত থাকি। ইতোমধ্যে ৬ প্রার্থীর মধ্যে ৫ জন প্রত্যহার করে, ১ জন প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীতাহীন ভাবে বিজয়ী হয়।' আসন্ন নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নির্বাচন কর্মকর্তাদের তথ্য সংগ্রহে পুলিশ দুই মাস পূর্ব থেকে মাঠে নেমেছে। তারা প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, সহকারি প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও পোলিং কর্মকর্তাদের বিষয়ে নানা রূপ তথ্য সংগ্রহ করছে ও জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কমিশন কোন নির্দেশনা দেয়নি। সুতরাং এসব কর্মকাণ্ড কে কী উদ্দেশ্যে করছে তা রহস্যজনক।' (*প্রথম আলো* ২৫ নভেম্বর ২০১৮) তখন অনেকে ভোট কেন্দ্রে বড় ধরনের সংঘর্ষ না হওয়াকে সুষ্ঠু পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি করতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গেও উক্ত কমিশনারের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য হতে পারে। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন স্থানে অনিয়ম সত্ত্বেও ভোট কেন্দ্রগুলিতে মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। শৃঙ্খলা কতটুকু বজায় ছিল তা প্রশ্ন সাপেক্ষ।' এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না কিভাবে মহা অশান্তির উপরে শান্তির বাতাবরণ রচিত হয়। সে সময় তার কথাকে

Scanned with CamScanner

গুরুত্ব দিয়ে যদি নির্বাচন স্থগিত করা হোত তাহলেও কিছুটা আস্থা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতো। যা হোক্ উল্লিখিত পরিস্থিতির খুব একটা হেরফের যে আগামী নির্বাচনে হবে তার পূর্ব লক্ষণ এখনও তেমন দেখা যাচ্ছে না।

জনসেবামূলক কর্তব্য-দায়িত্ব আর রাজনৈতিক বাণিজ্য এক নয়

রাজনীতিতে সেবা আর রাজনৈতিক বাণিজ্য দুটির অবস্থান দুই মেরুতে। এখন রাজনীতিকে জনসেবার বদলে দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সেবায় পরিণত করা হয়েছে। রাতারাতি অতি ধনী ও অতি ক্ষমতাবান বনে যাওয়ার উপায় হয়েছে সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী হতে পারা। একসময় রাজনীতিবিদদের জনসেবা করতে গিয়ে সম্পদের ক্ষয় হতো, এখন অবিশ্বাস্য রকমের বৃদ্ধি ঘটে। কেন এমন হলো? এটা একটা প্রক্রিয়ার ফল। নইলে রাজনীতিতে আসা এমনকি বুর্জোয়া রাজনীতিতে আসা মানুষগুলো জন্ম থেকেই খারাপ স্বভাব নিয়ে এসেছে এভাবে মূল্যায়ন করা অবৈজ্ঞানিক। যে কোন রাজনীতিই হোক্ মানুষের প্রতি ভালবাসা যে কোন মাত্রায়ই হোক না থাকলে কেউ রাজনীতিতে আসতে পারে না। আবার রাজনীতির গতিধারা প্রগতিশীলতার পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীলতায় প্রবাহিত হতে থাকলে মানবিক গুণাবলি বিকশিত না হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাদের ভাল-মন্দের ধারণা, হিতাহিত জ্ঞান, ন্যায়-অন্যায় বিচার লোপ পেতে থাকে। তখন সত্য, ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি না করে অন্যায় অবস্থানকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য তারা যুক্তি জুগিয়ে আনে। তাদের মধ্যে উগ্রতা অসহিষ্ণুতা দেখা দেয়। তখন অতীত সংগ্রামের অর্জনগুলো বিনষ্ট হতে দেখেও রুখে দাঁড়ায় না, যা চলছে তা স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। এই সংখ্যাবৃদ্ধি রাজনীতির গুণমান নষ্ট করে। একটা সময়ের অগ্রগতি প্রগতি চিরকালের অগ্রগতি থাকেনা যদি না তাকে গতির মধ্যে রাখা যায়। স্বাধীনতা পূর্বকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণিরও আপেক্ষিক অর্থে একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেবায় রত বুর্জোয়া-পাতিবুর্জোয়া শ্রেণির ততটা অবস্থানও আর নেই, থাকতে পারে না। সেজন্যই এত বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রগতিবাদী বামপন্থার শক্তিও এর ব্যতিক্রম হয় না যখন বামপন্থা হতাশা বিভ্রান্তির কারণেই হোক কিংবা স্বার্থ-সুবিধার জন্যই হোক্ দক্ষিণপন্থার নীতি কৌশলে এগুবার চেষ্টা করে। নীতিগত অবস্থান দৃঢ় রেখে নৈতিক-রাজনৈতিক সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনে কোন কৌশলই গ্রহণ করা যাবে না তা যেমন ঠিক নয়, তেমনি যে কৌশল নীতিগত অবস্থানের সাথে অসঙ্গগতিপূর্ণ তা নিয়ে চলাও শুদ্ধ নয়। কারণ তা সুবিধাবাদ থেকে উৎসারিত না হলেও শেষ পর্যন্ত সুবিধাবাদের দিকেই টেনে নিয়ে যায়। সংখ্যা ভারি হওয়াই সত্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়। যেমন ধরা যাক্ ১৯৪৬ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতাকালে হিন্দু মুসলমান যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল তাতে জাতীয়তাবাদী সমাজবাদী চেতনা ভুলে গিয়ে দুই সম্প্রদায়ের প্রায় পুরো অংশটাই দাঙ্গায় যুক্ত না হলেও সাম্প্রদায়িক মননে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। দাঙ্গাবাজরা সেই পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে নারকীয়

Scanned with CamScanner

উৎসবে খুনোখুনি করেছে, হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেদিন মানবতা, সভ্যতাকে উর্দ্ধে তুলে ধরেনি, বরং সে বর্বরতার অভিশাপ আজও উভয় দেশের মানুষকেই বহন করে যেতে হচ্ছে। আমরা এখনও আঞ্চলিকতা কেন্দ্রিক গ্রামে গ্রামে বা অঞ্চলে অঞ্চলে যে সংঘাত সংঘর্ষ দেখি তাতে এক গ্রামের অধিকাংশ মানুষই বেপরোয়া সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পরস্পরকে আহত নিহত করতে দ্বিধা করে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অধিকাংশ লোক একদিকে জড়ো হয়েছিল বলেই তা গণতান্ত্রিক চেতনা হতে পারে না বা সভ্য সমাজের ছবিও হতে পারে না। অথচ এখনও আমরা যুক্তিবর্জিত স্বার্থ-সুবিধা কেন্দ্রিক বা এক সময়ের অর্জন সাফল্য বা সময়ের চাহিদা পূরণে যে জনসংঘ, জনশক্তি বা জনসমর্থন তৈরি হয়েছিল সেই ঐতিহ্যের উন্মাদনা ছড়িয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছি। একবার এ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেলে তার পরিবর্তন খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্রের জায়গা দখল করে। প্রগতিবাদী চিন্তা ও সংগ্রাম প্রবল বাধা ও প্রতিকূলতার মুখে পড়ে। যুক্তি-বিবেক উন্মাদনা-উত্তেজনায় হারিয়ে যায়, গোঁড়ামি-কুযুক্তি আর বাচাল বিতর্ক সে স্থান পূরণ করে। দার্শনিক সহনশীলতা, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ স্থান পায় না। একই শ্রেণিগত কাঠামোর মধ্যে, একই দৃষ্টিভঙ্গি উদ্দেশ্য ও স্বার্থ লালন করেও তারা পক্ষ প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করে জনগণকে বিভাজিত করে একদিকে ভোট ব্যাংক অন্যদিকে সামরিক, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের বুনিয়াদ স্থাপন করে। এর সাথে আঞ্চলিকতা-সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি যেটা যেভাবে খাটে তা আত্মীকরণ করে নেয়, শক্তি বাড়ায়। এই বিভাজন যুক্তিসঙ্গতভাবে গরিষ্ঠতা সৃষ্টির প্রয়াস নয়, দলাদলি মনোভাবপুষ্ট দলভারী করার প্রচেষ্টা মাত্র। এই রাজনীতি জনগণের চেতনার মান ও সংস্কৃতিকে নামায় আর জনগণের নিম্ন চেতনা ও সংস্কৃতি এই বুর্জোয়া রাজনীতি ও রাজনৈতিক শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে, রক্ষা করে। এই পরিস্থিতি চলমান রেখে নির্বাচন বাস্তবে গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠায় আর গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী শক্তিকে অর্থে বিত্তে সম্পদশালী ও অধিকতর ক্ষমতাশালী হতে সাহায্য করে। বুদ্ধিবৃত্তির অবনমনকালে বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশও বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণে জাতিকে প্রগতির পথে আলো দেখিয়েছেন, স্বার্থ সুবিধা ত্যাগ করে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। সেই বুদ্ধিজীবীদের জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। কিন্তু তাদের উত্তরসূরী বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ আজ জাতিকে চলতি হাওয়ায় ঠেলে দিয়ে নিজেরাও ব্যক্তিগত স্বার্থ সুবিধা অর্জনে চিন্তার বদ্ধ জলাশয়ে আটকা পড়েছেন। একটা বড় অংশ পদ-পদবী বা খ্যাতি-পুরষ্কার লাভ ইত্যাদি মোহে প্রলোভনে শাসক শ্রেণির কাছে সমর্পিত হয়ে পড়েছেন। এরা যখন রাজনীতি ধারণ করেন তখন শাসক বুর্জোয়া শ্রেণিরই কোন না কোন অংশের পক্ষালম্বন করেন অথবা রাজনীতি বিমুখ জ্ঞানগর্ভ প্রতিপাদ্য হাজির করেন। এক্ষেত্রে চিন্তার ভ্রান্তি কতোটা আর স্বার্থ-সুবিধার হাতছানি কতোখানি তা নিরূপন করা সব সময় সহজ হয় না। তবে এদের একটা অংশের আক্রমণের

Scanned with CamScanner

লক্ষ্যবস্তু যতোটা না শাসক বুর্জোয়াশ্রেণি, তার চেয়েও বেশি বাম প্রগতিশীল শক্তি। বামপন্থীদেরকে তাচ্ছিল্য এমনকি ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও অনেক সময় তারা দ্বিধা করেন না। এদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের অতীত বাম রাজনীতি থেকে বিচ্যুতিকে যুক্তিসিদ্ধ করতে আবার অনেকে দুঃখ বেদনা ও হতাশাবোধ থেকেও বিরক্তি অস্বস্তি প্রকাশ করেন। একথা ঠিক যে বুর্জোয়া রাজনীতি সৃষ্ট প্রতিকূলতাই শুধু কারণ নয়, বামপন্থী রাজনীতির বড় ধরনের বহু ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির ইতিহাস যেমন রয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতেও করণীয় সঠিক সময়ে সঠিকভাবে করতে না পারার দৃশ্যমান বাস্তবতাতেও তার দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা বামপন্থার শক্তিকে এতটা দুর্বল করতে সহায়তা করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো নিন্দা উপহাস করে কী এর উত্তরণ ঘটবে? এই দুরাবস্থার কার্যকারণ উদঘাটিত করে সহানুভূতি ও সমর্থন জুগিয়ে সমাধান সূত্র বের করে এগিয়ে চলার ও গণমানুষের সাথে দূরত্ব কমিয়ে আনার বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা ও সংযোগ আজ অনেক বেশি প্রয়োজন। তা না হলে বামপন্থার রাজনীতিই শুধু ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, বুদ্ধিজীবীরাও মান মর্যাদা হারাবেন।

ভোট পঁচা তত্ত্ব ছাড়তে হবে

যেসব প্রার্থী টাকা খরচ করে ভোট কিনতে পারবে না, পেশি শক্তির মহড়া দিয়ে ভীতি এবং শক্তি প্রদর্শন করতে পারবে না, মিথ্যা ওয়াদা আশ্বাস দিয়ে প্রতারণা করতে পারবে না, রাজনীতিতে শেষ কথা নেই বলে সুবিধাবাদের যে কোন পঙ্কিল পথে হাঁটতে পারবে না, স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নীতি নিষ্ঠতার দৃঢ়তার বদলে খড়-কুটা-আবর্জনার মতো স্রোতের অনুকূলে ভেসে যাবে না, তাদের ভোট দিলে ভোট নষ্ট হয়। আর যারা টাকা দিয়ে ভোট কিনে, পেশি শক্তি ব্যবহার করে, মিথ্যা ওয়াদা দেয়, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সুবিধাবাদের আশ্রয় নেয়, তাদের ভোট দিলে সেইসব প্রার্থী বিজয়ী হয়, কিন্তু গণতন্ত্র, আদর্শ, ন্যায়-নীতি মূল্যবোধ পরাস্ত হয়, বিবেক পঁচে যায়। এ বোধ চাপা দিতেই একদল লোক প্রচার করে বেড়ায়, যাকে ভোট দিলে জিততে পারবে না তাকে ভোট দিলে ভোট পঁচে যাবে। এটা আসলে একটা পঁচা তত্ত্ব। কারণ যুক্তি-বুদ্ধি, নীতিবোধ ও বিবেক পঁচিয়ে দিয়ে ভোটকে সতেজ রাখা যায় না, বরং এই ভোট রাজনীতিকে-সমাজকে পঁচতে সহায়তা করে। ফলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার এই ভোট পঁচা তত্ব প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

আন্দোলন নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করা প্রয়োজন

আমরা যখন বলি আন্দোলনের অংশ হিসাবে নির্বাচনকে আমরা দেখি, তার একটা তাৎপর্য রয়েছে। মানুষের শরীরে রক্ত যতক্ষণ আন্দোলিত হয়ে চলাচল অব্যাহত রাখে ততক্ষণ মানুষ জীবিত থাকে। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনেও ভালো-মন্দ, সঠিক-বেঠিক, ন্যায়-অন্যায়, সুশাসন-কুশাসন ইত্যাদি নিয়ে তর্কে-বিতর্কে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় নীতির সংগ্রামে যতো বেশি সমাজকে আন্দোলিত করা যায় ততোই সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সবল হয়। জনগণের শাসন তথা গণতন্ত্র

Scanned with CamScanner

নিষ্প্রাণ জনগণের জন্য আপনা আপনি তৈরি হয়ে যায় না। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে শোষকশ্রেণি গণতন্ত্রের মুখোশ পরিয়ে স্বৈরতন্ত্রকে আড়াল করে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। অশান্তির বীজ রোপন করে শান্তির জন্য রোদন করতে থাকে। অথবা ন্যায়সঙ্গত দাবি ও আন্দোলন দমনে খড়গহস্ত হয়। শোষণ লুণ্ঠনের ভাগ-বাটোয়ারা থেকে বঞ্চিত একই গোষ্ঠীর লোকেরা অনেক সময় বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষুব্ধ মেজাজ কাজে লাগিয়ে তাদের বলি দিয়ে সংকীর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর হয়। এই তৎপরতা শান্তিপূর্ণ হোক বা সহিংস হোক তা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর্যায়ে পড়েনা। পরিষ্কার প্রগতিমুখী জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সচেতন জনগণের অংশগ্রহণে আন্দোলিত জনগণই গণআন্দোলনের চেহারা তৈরি করে। শাসক শোষক শ্রেণি তাদের জবরদস্তিমূলক নিপীড়নের মাধ্যমে ঐ আন্দোলনকে সহিংসতার দিকে ঠেলে দিলে তাকে প্রতিহত করার যে কোন গণউদ্যোগই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংজ্ঞায় পড়ে। যেমন ১৯৭০ সালের নির্বাচন যেমন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ, তেমনি ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধও গণতান্ত্রিক সংগ্রামেরই উঁচু ধাপ মাত্র। জনগণের আকাঙ্খা ও ন্যায়সঙ্গত দাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কিভাবে নির্বাচনকে গণতন্ত্রমুখী করে তা আমরা দেখেছি ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হওয়া বাংলা ভাষার দাবি ও ২১ দফায় জনস্বার্থ রক্ষার দাবিতে পূর্ব বাংলার (আজকের বাংলাদেশ) জনগণ যেভাবে ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে তাতে সেই নির্বাচন-গণআকাঙ্ক্ষার পরিপূরক নির্বাচন হয়েছিল। একইভাবে ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত ৬ দফা, ১১ দফা ভিত্তিক জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার থেকে স্বাধীনতার চেতনা বিকাশের মধ্য দিয়ে সে নির্বাচনও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অংশে পরিণত হয়েছিল। তবে এটাও লক্ষণীয় যে গণচেতনা ও গণআকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল তা পাকিস্তানী উপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব ছিল না বিধায় নির্বাচনী ঐক্য ও সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে শাসকশ্রেণির উদ্দেশ্য পরিকল্পনা যাই থাকুক জনগণের ঐক্য ও সংগ্রামের শক্তি যদি তার চেয়ে প্রবল হয় তাহলে শাসকশ্রেণির পরিকল্পনার ছক ব্যর্থ করে এগিয়ে চলা সম্ভব হয়। যে কারণে পাকিস্তানী উপনিবেশিক শক্তির ব্যূহ ভেদ করে স্বাধীনতার সুপ্ত চেতনা ধারণকারী ঐক্যবদ্ধ বাংগালী আদিবাসী জনতার শক্তি বিজয়ী হতে পেরেছিল।

আজ পরিস্থিতি ভিন্ন

নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা-অযোগ্যতাও নির্ধারিত হচ্ছে শাসক-শোষক শ্রেণির ইচ্ছা পূরণের অংশ হিসাবে। নির্বাচনে সমতল ভূমি নিয়ে হৈ চৈ এর কমতি নেই। কিন্তু কথিত লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বা সমতল ভূমি যারা ক্ষমতার মালিক সেই জনগণের জন্য কতটুকু রয়েছে? যারা মালিকের হুকুম, ইচ্ছা, স্বার্থ পূরণে সেবাকর্মী হিসাবে কাজ করবে তাদের তো প্রথমে মূল মালিক জনগণের সামনে যে পাহাড়-

Scanned with CamScanner

নদী অসমতা রয়েছে তা দূর হবে কিভাবে তা ভাবা দরকার ছিল। শ্রমজীবী মানুষ যারা দেশের মালিক তাদের বেসিক ৪ হাজার ১ শত ৬০ টাকা আর সরকারি কর্মকর্তা সচিবের বেসিক ৮৭ হাজার টাকা অর্থাৎ মালিকের বেতন সর্ব সাকুল্যে আট হাজার টাকা আর কর্মচারীর বেতন আশি হাজার থেকে দুই তিন লাখ টাকা হলে এ কেমন সমতা? টাকাওয়ালাদের একটি শিশু সন্তান ষাট-সত্তর হাজার টাকা দিয়ে প্রাইভেট স্কুলে পড়তে পারে আর অসংখ্য শিশু সত্তুর আশি টাকা জোগাড় করতে না পেরে ও পরিবারের বোঝা টানতে স্কুলে যেতে পারে না। জনপ্রতিনিধিদের ১০ গুণ থেকে ৩০০ গুণ সম্পদ বাড়ে, কয়েকটা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও ঢাকা শহরে প্লট পায় আর ঢাকা শহরেই ত্রিশ লক্ষ মানুষ বস্তিতে বাস করে। তারা ট্যাক্স ফ্রি দুই তিন কোটি টাকা দামের গাড়িও অনেকে ব্যবহার করে আর রিক্সা চালক, ভ্যান চালক, হকার মালিকেরা ট্রাকের ছাদে চড়ে বাড়ি ফেরে, দুর্ঘটনায় মরে। এগুলো কোন সমতাকে নির্দেশ করে?

সংবিধান বিতর্ক কখন ওঠে, কেন ওঠে?

দেশে নির্বাচন আসলে কিংবা ক্ষমতাকেন্দ্রিক কোন ঝামেলা হলেই শাসক শ্রেণি সংবিধানের দোহাই দেয়া শুরু করে। ভোটার বিহীন নির্বাচন করতেও সংবিধান জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু জনগণের গণতান্ত্রিক-মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে, সুশাসন বা গণতান্ত্রিক শাসনের প্রশ্নে, গণতান্ত্রিক আইন কানুন বিধি বিধান ইত্যাদি সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় কিনা, খাপ খায় কিনা সে প্রশ্নে সংবিধান চাপা পড়ে থাকে। যেমন সংবিধান খুললেই যে প্রস্তাবনা চোখে পড়ে 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল -জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানে মূলনীতি হইবে।' গত ৪৮ বছরে এই মূলনীতিকে যে মূলসহ উপড়ানো হয়েছে সে ব্যাপারে কোন আলোচনা নেই। তারপর শাসনব্যবস্থা কিভাবে কোন লক্ষ্যে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে,' সামরিক-অসামরিক স্বৈরতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা বহাল রেখে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন কিভাবে আবিষ্কার করা যাবে, মুক্ত বাজারী অর্থনীতি চালিয়ে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে তা কীভাবে জানা যাবে কিংবা 'ক্রসফায়ার' এর নামে বিনা বিচারে হত্যা করে, সাদা পোষাকে আইন রক্ষা বাহিনী কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে গুম করে ফেলে কিভাবে আইনের শাসন, সুবিচার কিংবা মৌলিক মানবাধিকার রক্ষিত হবে তা সত্যিই গবেষণার বিষয়। তাছাড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যই

Scanned with CamScanner

বা কীভাবে লুটতরাজের পুঁজিবাদে দাঁড়াবে তা ভাবার বিষয়। আবারও অনুচ্ছেদ-১০ : এ 'সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি' শিরোনামে লেখা হয়েছে,'—মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সামজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।' আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এইভাবে অনুচ্ছেদ-১৫ : 'মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা' শিরোনামে...'পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে...(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; (খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার, (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার ইত্যাদি লেখা আছে কিন্তু...' বর্তমানে কি হচ্ছে? অনুচ্ছেদ-১৭ : 'অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা' শিরোনামে '—রাষ্ট্র ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য;...' বলা হলেও বর্তমানে ৩ ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা (সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা) চালু রয়েছে। সর্বজনীন অর্থাৎ সকলের জন্য শিক্ষা এখনও সুদূর পরাহত আর শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ ব্যাপকভাবে ঘটানো হচ্ছে। ফলে টাকা যার শিক্ষা তার এইনীতি বাস্তবায়ন হচ্ছে। অনুচ্ছেদ-১৯ : 'সুযোগের সমতা' শিরোনামে '১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে।' নাগরিকদের সুযোগের সমতা কতটা আছে সেটা বাদ দিয়ে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশীদের গদি দখলের প্রতিযোগিতায় সুযোগের সমতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অনুচ্ছেদ-২০ : 'অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম' শিরোনামে ২) রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন। যেখানে সাধারণ নীতি, হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না ...' তাহলে বছর বছর বাজেটে কালো টাকা সাদা করা হয় কেন? ৫ বছরে সাংসদদের সম্পদ গড়ে ৩২৪% পর্যন্ত বেড়ে যায় কীভাবে? তাদের স্ত্রীদের আয়ের কোন উৎস না থাকা সত্ত্বেও সম্পদ শতগুণ বৃদ্ধি পায় কোন আলাদিনের চেরাগে? এগুলি উপার্জিত আয় হয় কিভাবে? বিদেশে টাকা পাচারকারী, ২য় বাড়িঘর সৃষ্টিকারী, ব্যাংকের শেয়ার বাজারের টাকা লুণ্ঠণকারীদের সম্পদ উপার্জিত আয় হয় কীভাবে? তাহলে দুর্নীতি দমন কমিশনেরই বা কাজ কী? যে ব্যক্তিরা সম্পদের সঠিক হিসাব দিতে পারবে না তাদের আইনের আওতায় আনা, সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করা আর নির্বাচিত হলেও সে নির্বাচন বাতিল ঘোষিত হবে না কেন? অনুচ্ছেদ-১৮ : 'জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা' শিরোনামে '২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' শুধু দেশের ভিতরে নয় হাজার হাজার দুঃস্থ নারী বিদেশে পাচার হয়ে বিভিন্ন দেশের পতিতালয়ে স্থান পাচ্ছে। এদের মর্যাদাপূর্ণ পুনর্বাসন ও নারী, শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে কি কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তা

Scanned with CamScanner

দৃশ্যমান না। অনুচ্ছেদ-২২: 'নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ' শিরোনামে রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন"। কিন্তু বাস্তবে নিম্ন আদালত পুরোপুরি নির্বাহী কর্তৃত্বের অধীন, উচ্চ আদালত রিমোর্ট কনট্রোলে পরিচালিত। অনুচ্ছেদ-২৩ ক) শিরোনামে 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা প্রহণ করিবেন। অথচ বাংলাভাষী বৃহৎ বাংগালী জনগোষ্ঠি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠি মিলেই বাংগালী জাতি। কিন্তু আজও তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি মিলেনি এবং তাদের স্বতন্ত্র ভাষা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ প্রক্রিয়ায় মূলধারার সাথে সংযোগ ও সমন্বয় করার রাষ্ট্রীয় যথার্থ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। ২২ বছর আগে কিছু অসম্পূর্ণতা নিয়ে হলেও যে পার্বত্য চুক্তি হয়েছিল তাও আজ পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। সংবিধানের 'তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার' অনুচ্ছেদ-২৬ : মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল শিরোনামে '১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। ২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসমাঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।' তাহলে বিশেষ ক্ষমতা আইন ৭৪, ৫৪ ধারা, আইসিটি আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ অসংখ্য কালো আইন থাকার কথা নয়। কিন্তু সংবিধানের ২য় সংশোধনীর ক্ষমতাবলে এই অনুচ্ছেদ এর ৩ এ বলা হলো - '৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।' অর্থাৎ সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত দুই তৃতীয়াংশ এর ভোটে গৃহীত হলে মৌলিক অধিকারের সহিত অসমাঞ্জস্য আইন বলবৎ করা যাবে। অনুচ্ছেদ-২৫: 'আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন' শিরোনামে লেখা হয়েছে, 'গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।' কিন্তু আমেরিকা, ইউরোপসহ বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামে বাংলাদেশ পার্লামেন্টে বা সরকারের পক্ষ থেকে বলিষ্ঠ উচ্চারণ বা সমর্থন তেমন পরিলক্ষিত হয় না। ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থানও শাসকশ্রেণিভুক্ত কোন দলকে নিতে দেখা যায়নি। ইয়েমেনে সৌদি সামরিক হামলার ব্যাপারে সরকারি নীরবতা রয়েছে। উপরন্তু এই অনুচ্ছেদের অঙ্গীকারকে অস্বীকার করে সৌদি আরবের সাথে সামরিক যুদ্ধজোটে যুক্ত করেছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে। অনুচ্ছেদ-২৮ : 'ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য' শিরোনামে "২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।" এখনও

Scanned with CamScanner

সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নেই। অনুচ্ছেদ-৩৩ : "গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ; শিরোনামে '১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। ২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদারকিকালে প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।" এর পরই তা নাকচ করা হয়েছে আরেকটি ধারা দিয়ে "৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ক) যিনি বর্তমান সময়ে বিদেশী শত্রু, অথবা খ) যাহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান সম্বলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা আটক করা হইয়াছে।" এটা বিশেষ ক্ষমতা আইন '৭৪ এর মতো কালো আইন দ্বারা কিভাবে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। অনুচ্ছেদ-৩৫ : 'বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ' শিরোনামে "৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।" কিন্তু থানা হাজতে বা নিরাপত্তা হেফাজতে নিষ্ঠুর নির্যাতন, টাকা আদায় এমনকি বহু মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে অহরহ। এইভাবে অসংখ্য দৃষ্টান্ত টানা যাবে, বহু অসঙ্গতি দেখানো যাবে, অথচ এসব অসঙ্গতি দূর করার ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব দিতে দেখা যায় না। আইনসভার সদস্যদের এ সকল বিষয়ে মনযোগ বা আগ্রহ দেখা যায়নি। শুধু ক্ষমতায় উঠা নামার বিষয় আসলেই সংবিধান নিয়ে টানাটানি শুরু হয়। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কতটা কাটা হয়েছে বা যতোটা অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া আছে তার লংঘন কিভাবে হচ্ছে, তা নিয়েও তেমন আলোচনা নেই। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোসহ রাষ্ট্রীয় অপরাপর প্রতিষ্ঠানগুলোও যে গণতান্ত্রিক আইনানুগ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নেই সে বিষয়েও শাসক শ্রেণির রয়েছে নীরবতা।

খোদ নির্বাচন কমিশনই এখনও পর্যন্ত আইনী ভিত্তির উপর দাঁড়ায়নি। অনুচ্ছেদ-১১৮ তে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা প্রশ্নে বলা হয়েছে, 'আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে' নির্বাচন কমিশন নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। সে লক্ষ্যে এখনও কোন আইন প্রণীত হয়নি। কখনও রাষ্ট্রপতি নিজস্ব ক্ষমতায় অথবা সার্চ কমিটি ধরনের এডহক ব্যবস্থাপত্রে নির্বাচন কমিশন গঠন করে চলেছেন। তাছাড়া নির্বাচন কমিশনকে শুধুমাত্র, "ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; বাকী নির্বাচনগুলোর এখতিয়ার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বলা নেই। স্থানীয় সরকার হর হামেশা বলা হলেও সংবিধানের ইংরেজি ভার্সনে 'Local Govt' বলা হলেও বাংলা করা হয়েছে, "অনুচ্ছেদ-৫৯ : স্থানীয় শাসন।" স্থানীয় সরকার কাঠামো কয় স্তরে কিভাবে বিন্যস্ত হবে, সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিত্ব (বিভাগ,

Scanned with CamScanner

জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ইত্যাদি) কীভাবে নিশ্চিত হবে এবং পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদির সাথে কীভাবে সমন্বিত ও ভারসাম্যমূলক হবে, নির্বাহী কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ, সাংসদদের হস্তক্ষেপ ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত কিভাবে থাকতে পারে সে বিষয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে। সংবিধানের ৭০ ধারায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাস্তবে সংসদীয় দলের অন্ধ স্তাবকে পরিণত করে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি যেভাবে আছেন অর্থাৎ অনুচ্ছেদ-৪৮ এ 'রাষ্ট্রপতি' শিরোনামে "৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন; তবে শর্ত থাকে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলেও কী পরামর্শ দান করিয়াছেন কোন আদালতে সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নে তদন্ত করিতে পারিবেন না।" সেজন্য একজন রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, বেশ কিছু ক্ষমতার কথা লিপিবদ্ধ থাকলেও বাস্তবে রাষ্ট্রপতির হাল হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা ব্যতীত স্বেচ্ছায় মৃত ব্যক্তির জানাযায় অংশ নেয়া ছাড়া তেমন কোন বিশেষ কাজ থাকে না। এগুলির পরিবর্তন আবশ্যক। অর্থাৎ সাংবিধানিক অসম্পূর্ণতা স্বৈরতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারমূলক বিধি বিধানগুলো দূর করে গণতান্ত্রিক শাসনের উপযোগী করা দরকার।

প্রগতিপন্থায় নবপ্রজন্মই দিন বদল ঘটাবে

নির্বাচন হলেই যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তা বলা যায় না। কারণ নির্বাচন স্বৈরতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার উপায়ও হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দেশে নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক শাসন দুটোই অনিরসনীয় সংকটে পড়েছে। নির্বাচন যেখানে সংকটাপন্ন, সেখানে গণতন্ত্র কিভাবে আসন্ন হয়? কারণ এই সংকটের অন্তর্নিহিত মূল কারণ হিসাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনের ঐতিহাসিক চাহিদা সময়ের তাগিদ হিসাবে হাজির হয়েছে ধরা যায়। মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা থেকে দূরগামী শাসন পদ্ধতি সার্বিক সংকটকে দিনে দিনে বাড়িয়ে তুলেছে, বেদনাদায়ক ঘটনা প্রবাহের জন্ম দিয়েছে। শাসক শ্রেণির এক অংশকে ধ্বংস করে অপর অংশের টিকে থাকার নিরাপত্তার শর্ত তৈরি করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলতার উপাদানসমূহকে রাষ্ট্রীয় মদদ জুগিয়ে প্রগতির শক্তিকে দুর্বল করা, প্রগতির পথ রুদ্ধ করার নানা আয়োজন চলছে। তবে মুক্তিযুদ্ধের বাংলায় আশার প্রদীপ নিভে যেতে পারে না। বারে বারে তারুণ্যের মাথা তোলা বিদ্রোহের জাগরণ আলোর ঝলকানিতে ভবিষ্যতের স্বপ্নভরা আশা নিয়ে সুদিনের ছবি এঁকে যায়। গণজাগরণ মঞ্চে, কোটা সংস্কার আন্দোলনে, নিরাপদ সড়ক অভিযানে, নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে, শিক্ষার দাবি, পরিবেশ ও জাতীয় সম্পদ রক্ষার দাবিতে বারে বারে ফুঁসে ওঠা নব প্রজন্মের এই শক্তিই দেবে ভবিষ্যতের দিশা। বুর্জোয়া শক্তি এই তারুণ্য ও যৌবনের শক্তিকে ধারন করতে পারবে না। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বামপন্থীদের সকল দুর্বলতা কাটিয়ে প্রগতির

Scanned with CamScanner

পথে নব প্রজন্মের তারুণ্য ও যৌবনের শক্তিকে টেনে আনতে হবে। অন্যথায় ব্যর্থতার বোঝা জাতিকে আরও বহুকাল বয়ে বেড়াতে হবে। নির্বাচনকে লুটপাটের, অর্থবিত্ত অর্জনের পথ ও পন্থা থেকে নীতি আদর্শ ভিত্তিক জনগণের উত্থানের শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলেই নির্বাচনের কার্যকারিতা আসবে, নির্বাচন আন্দোলনের অংশ হবে, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথ বেয়ে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ কায়েম হবে। মুক্তিযুদ্ধের অপূরিত আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হবে, লাখ শহীদের রক্ত ঋণ শোধ হবে।

Scanned with CamScanner

করণীয়

আমরা নির্বাচিত হলে পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে জনস্বার্থে করণীয় কাজ ও দাবি আদায়ের সংগ্রাম জোরদার করবো যাতে সরকারের যে কোন গণবিরোধী পদক্ষেপকে মোকাবেলা করে তা থামানো যায় এবং যে মাত্রায়ই হোক, গণদাবি আদায় করা সম্ভব হয়। যে আলামত দেখা যাচ্ছে তাতে ভোট কেন্দ্র দখলের নির্বাচন যদি হয়, তাতে আমরা পার্লামেন্টে যেতে না পারলেও জনস্বার্থে করণীয় কাজ ও দাবি আদায়ের সংগ্রাম আমরা দলগত এবং জোটগতভাবে চালিয়ে যাবো। আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে এবং ক্রমাগত চাপবৃদ্ধি করে গণদাবি আদায়ে সাফল্য আনার ও সংগঠন-আন্দোলন বিকশিত ও শক্তিশালী করার চেষ্টা চালাবো যাতে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র শাসন ক্ষমতা দখলের পথ সুগম হয়। ভবিষ্যতে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল ক্ষমতা লাভে কৃতকার্য হলে আমরা স্বল্পমেয়াদী ও সুদূরপ্রসারি কার্যক্রম গ্রহণ করবো। দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সকল শক্তির সহযোগে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা বাস্তবায়নে আমরা অগ্রসর হবো। আমাদের দলের দাবিনামা ও করণীয় কর্তব্য কর্মের দিকদিশা রয়েছে। নির্বাচনের হালচাল দেখে আমরা পরবর্তীতে সেগুলি আরও বিশদ ও সুনির্দিষ্ট করে হাজির করার চেষ্টা করবো। এখন আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা করণীয় কাজের সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা হাজির করছি।

এক) রাজনৈতিক

ক) রাজনৈতিক নেতা-কর্মীসহ সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক চেতনাগত মানোন্নয়ন ও জনউদ্যোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক প্রগতিমুখী বহুধারার চর্চা অব্যাহত রাখা হবে। যাতে তারা শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ বুঝতে ও ভূমিকা রাখতে পারে।

খ) পার্লামেন্ট সদস্যদের সর্বসম্মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থনের ভিত্তিতে মন্ত্রীসভা ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবে। মন্ত্রীসভার সদস্যদের সর্বসম্মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবে।

গ) রাষ্ট্রপতি আইনের ও জবাবদিহিতার উর্দ্ধে থাকবেন না। প্রধানমন্ত্রীর যে কোন পরামর্শ রাষ্ট্রপতির জন্য শিরোধার্য থাকবে না। তিনি যদি অনুমোদনযোগ্য মনে না করেন তবে মন্ত্রীসভায় এবং পার্লামেন্টে বিতর্কের জন্য তা পুনরায় উত্থাপনের জন্য পাঠাতে পারবেন। বিলে স্বাক্ষর না করলে ১৫ দিন পর আপনা আপনি অনুমোদিত বলে গণ্য হওয়ার বিদ্যমান বিধান বাতিল করা হবে।

ঘ) মন্ত্রীসভাকে সর্বোচ্চ ২০টিতে সীমাবদ্ধ রেখে মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমগুরুত্ব দিয়ে

Scanned with CamScanner

অধিদপ্তর/বিভাগীয় কার্যক্রমে অপরাপর রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মাথাভারি প্রশাসন কমিয়ে কার্যকারিতাসম্পন্ন ব্যয় সংকোচন ও কাজের গতি বৃদ্ধি করা হবে।

ঙ) মন্ত্রী পরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্য ও সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ প্রতিবছর তাদের সম্পদের পূর্ণ বিবরণী দাখিল করবেন। দলদাস না হলে ওএসডি করার চলতি প্রথা রোধ করা হবে। ওএসডি যদি অতিরিক্ত বা অযোগ্য সাব্যস্ত হয় তাহলে একই স্থানে অবসর বসিয়ে না রেখে যোগ্যতা সাপেক্ষে ভিন্ন সমকাজে নিয়োগ দেয়া হবে। সাংবিধানিক ও সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরও প্রতিবছর সম্পদের বিবরণী দাখিল করতে হবে। যা জনগণের কাছে প্রকাশ্য দলিল হিসাবে থাকবে।

চ) জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাইরে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম স্তরে বিন্যস্ত করা হবে। স্থানীয় সরকারকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। (লোকাল গভর্নমেন্ট) Local government এর বাংলা 'স্থানীয় শাসন' এর বদলে স্থানীয় সরকার করা হবে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যে আত্মীকরণ ও সমন্বিত করা হবে। স্থানীয় সরকারে সাংসদদের কোন কার্যক্রম বা হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। সংসদীয় কমিটি তদারকি ও জবাবদিহিতার দায়িত্ব নিতে পারেন। শুধুমাত্র আদালতে চার্জশীট দাখিল হলেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বরখাস্ত করার বিধান তুলে দেয়া হবে। সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক কোন দণ্ড নিশ্চিত হলে কিংবা ভোটার জনগণ রিকল করলে তারা প্রতিনিধিত্ব হারাবেন। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত সদস্যরাও প্রতিনিধিত্বকালীন সময়ে নির্বাচিত এলাকার বাইরে কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ করতে পারবেন না।

দুই) গণতন্ত্র-সুশাসন

সংবিধান প্রণয়নকালীন সময়ের অসম্পূর্ণতাসহ পরবর্তীকালের সকল প্রকার অসংগতি দূর করে '৭২ এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা হবে। বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনারসহ সকল সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়োগ মানদণ্ড আইনানুগ করা হবে। সাংবিধানিক কমিশন গঠন করে তা বাস্তবায়ন করা হবে। ৭০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের সকল অগণতান্ত্রিক সংশোধনী ও বিধি বিধান বাতিল করা হবে। বিশেষ ক্ষমতা আইন ৭৪, ৫৪ ধারা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ নিবর্তনমূলক সকল আইন বাতিল করা হবে। বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত ও নিম্ন আদালতের উপর নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব বিলোপ করে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা হবে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে আইনানুগভাবে যৌথ কর্তৃত্বে ও এক বাহিনীর অধীনে বিন্যস্ত ও পরিচালনা করা হবে। দলবাজ, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সকল প্রশাসনিক স্তর থেকে অপসারণ করা হবে।

পুলিশসহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে উপনিবেশিক আমলের আইন কানুন বিধি বিধান বাতিল করে স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক শাসনোপযোগী করে ঢেলে সাজানো হবে। পুলিশ কনস্টেবলদের কর্মঘণ্টা ৮ ঘণ্টা হবে। কোন পুলিশ কর্মকর্তা উদ্দেশ্যমূলক বেআইনীভাবে কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু করলে বা নথিবদ্ধ করলে আদালতে উদ্দেশ্যমূলক প্রমাণিত হলে মামলার জন্য নির্ধারিত সাজা ঐ পুলিশ কর্মকর্তাকে ভোগ করতে হবে। একইভাবে ময়না তদন্তে অসঙ্গতিপূর্ণ,

Scanned with CamScanner

অজ্ঞতাজনিত কিংবা উদ্দেশ্যমূলক ভুল রিপোর্ট প্রমানিত হলে শাস্তিসহ তার ডাক্তারী সনদ বাতিল করা হবে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ আইন করে নিষিদ্ধ করা হবে। রিমান্ডের নামে পুলিশ হেফাজতে শারীরিক-মানসিক নির্যাতন বন্ধ করা হবে। বিচার বহির্ভূত হত্যা, গুম খুন বন্ধ এবং এর জন্য দায়ীদের আইনের আওতায় আনা হবে।

নিম্ন ও উচ্চ আদালতের বিচারক, আইনকর্মকর্তা, সহকারী সচিব থেকে সচিব, নির্বাচন কমিশন সদস্য, দুদক কর্মকর্তা, পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর থেকে আইজিপি পর্যন্ত সকলের বাৎসরিক সম্পদ মালিকানা বিবরণী ন্যায় পাল অথবা রাষ্ট্রপতির দপ্তরে জমা দিতে হবে যা জনগণের সামনে উন্মুক্ত থাকবে।

সরকারি কর্মকর্তাদের এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পূর্বানুমতি নেয়ার বিধান তুলে দেয়া হবে।

জাতীয় বাজেট আমলাতান্ত্রিকভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রণয়ন করার বদলে সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে ধাপে ধাপে কার্যকর জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে উপরে আসবে আর অনুমোদিত বাজেট বাস্তবায়ন তথা অর্থছাড় যথাস্থানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মধ্য দিয়ে হবে। খাতওয়ারি বরাদ্দের তালিকা পূর্বেই জনসমক্ষে প্রকাশিত থাকবে।

তিন) দুর্নীতি

দুর্নীতি-অপচয়-লুটপাট বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। অনুপার্জিত আয়, কালো টাকা সাদা করার বিধান বাতিল করা হবে। আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অবৈধ উপার্জনকারীদের আইনের আওতায় আনা হবে। বিদেশে পাচার হওয়া টাকা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে। স্বীকারোক্তি দিয়ে কেউ স্বেচ্ছায় টাকা ফেরৎ দিলে তাদের শাস্তির বিষয় বিবেচনা করা হবে।

দেশে অর্থনীতির সার্বিক বিবেচনায় ও বিশেষজ্ঞ মতামতে ব্যাংক সংখ্যা ৫৯ থেকে কমিয়ে আনা হবে। আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতি, অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা দূর করতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর থেকে অর্থমন্ত্রণালয়ের খরবদারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া হবে। তদন্ত সাপেক্ষে ঋণ আত্মসাৎকারীদের স্থাবর অস্থাবর সম্পদ জব্দ করে খেলাপী ঋণ উদ্ধার করা হবে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত দেনাদারদের পুনর্বাসন বা উঠে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা বিবেচনা করা হবে। ব্যাংক-বীমাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পারিবারিকীকরণ, দলীয়করণ বন্ধ করা হবে। শেয়ার মার্কেটসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির হোতাদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে।

মজুতদার, মুনাফাখোর, কালোবাজারী সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম বন্ধ, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য পণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু, টিসিবিকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করা হবে।

চার) নির্বাচন

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হবে। অর্থাৎ যে দল যত শতাংশ ভোট পাবে সেই দলের ততো সংখ্যক সদস্য সংসদে থাকবে। সাংসদরা আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয়

Scanned with CamScanner

নীতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও জনস্বার্থ লংঘনের বিষয়ে জবাবদিহিতামূলক তদারকি করবেন। স্থানীয় পর্যায়ের কোন কাজে সরাসরি যুক্ত থাকবে না। নির্বাচনকে টাকা, পেশি শক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ইত্যাদি থেকে মুক্ত করা হবে। না ভোটের বিধান ও ভোটারদের প্রতিনিধি প্রত্যাহারের (Right to recall) ব্যবস্থা চালু করা হবে। দল নিবন্ধনের অগণতান্ত্রিক বিধান ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ১ শতাংশ ভোটারের আগাম সমর্থন সূচক স্বাক্ষরের বিধান বাতিল করা হবে। RPO সংশোধন করে কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করে সদস্যত্ব লাভের ৩ বছরের মধ্যে দলের মনোনয়নে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে না পারার বিধান যুক্ত করা হবে। বাংলাদেশের বিশেষ বাস্তবতার কারণে দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে নির্বাচনকালীন তদারকী সরকারের বিধান করা হবে। নির্বাচন কমিশন সংবিধান বর্ণিত 'আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে' গঠন করা হবে। সেই লক্ষ্যে আইন করা হবে।

সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইচ্ছুকদের নির্বাচনের ৩ মাস আগে দলের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচন কমিশনে হলফনামা দলীয়/ স্বতন্ত্র দাখিল করার বিধান যুক্ত করা হবে যাতে, নির্বাচন কমিশন দুদক ও এনবিআর এর মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অসঙ্গতি পেলে বা সম্পদ অর্জনের সঠিক হিসাব দেখাতে না পারলে সম্পদ বাজেয়াপ্ত, আইনের আওতায় আনা ও প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করতে পারে। ব্যবসায়ী মালিকানা স্বত্ব বহাল রেখে এবং ঋণ খেলাপী ও যুদ্ধাপরাধী হলে কেউ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব থাকাকালীন সময়ে নির্বাচনী এলাকার বাইরে কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ করলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে। সাংসদদের করমুক্ত গাড়ী, ঢাকায় প্লট বরাদ্দ বন্ধ করা হবে। নির্বাচনী এলাকায় রাষ্ট্রীয় খরচে সাংসদদের বসবাস ও জীবনযাপনের সুব্যবস্থা করা হবে। প্রবাসীদের ভোট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ নেয়া হবে।

পাঁচ) শিক্ষা

সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে ও স্বৈরাচার বিরোধী ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের ১০ দফার ভিত্তিতে সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার, বৈষম্যহীন একই পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে। টাকার বিনিময়ে নয় শিক্ষা সকলের জন্য সমভাবে একই ধারায় সমসুযোগে উন্মুক্ত করা হবে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারিকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ করা হবে। স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষা খাতে জিডিপি'র ৬ শতাংশ বরাদ্দ করা হবে এবং গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ানো হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক পরিচালনা বিধি দ্বারা পরিচালিত হবে। ডাকসুসহ সকল সরকারি-বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও কলেজে নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হবে। পিইসি, জেএসসি, জেডিসি পরীক্ষা বাতিল করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালু করা হবে। সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন-ফি নির্ধারণে অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টীমার, বিমানসহ সকল যানবাহনে ৫০% ছাত্র কনসেসন দেয়া হবে। স্কুল থেকে শিক্ষা কার্যক্রমে নাচ, গান, ছবি আঁকা, খেলাধুলা,

Scanned with CamScanner

শরীরচর্চা, সামরিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কোর্স যুক্ত করা হবে। প্রতি ২০০ পরিবারের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রতি ইউনিয়নে অন্তত একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রতি থানায় সরকারি উচ্চমাধ্যমিক কলেজ এবং প্রতি জেলায় অন্তত একটি স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে প্রণীত ২০ বছর মেয়াদী UGC'র কৌশলপত্র বাতিল করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সর্ব মহলের সাথে পরামর্শক্রমে আমাদের নিজস্ব নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করা হবে। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এম.বি.বি.এস ডাক্তার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হবে। শিক্ষকদের সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদা, বেতন-ভাতা নিশ্চিত ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে।

ছয়) স্বাস্থ্য

জনগণের চিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে বহন করা হবে। চিকিৎসা সকলের জন্য সমভাবে সমসুযোগে উন্মুক্ত করা হবে। চিকিৎসা নিয়ে বাণিজ্য বন্ধ করা হবে। ওষুধের দাম, মান নিয়ন্ত্রনের জন্য বিশেষ কাউন্সিল গঠন করা হবে। মেয়াদউত্তীর্ণ ও ভেজাল ঔষুধ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি'র ৫ শতাংশ বরাদ্দ করা হবে। শুধু কিউরেটিভ নয়, রোগ প্রতিরোধ (প্রিভেনটিভ), রোগ প্রতিকার মূলক (কিউরেটিভ) ও সার্বিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা গবেষণামূলক (রিসার্চ) এই তিন ভিত্তির উপর চিকিৎসা সেবাকে দাঁড় করানো হবে।

প্রতি ইউনিয়নে মাতৃসদন, শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্র, গণস্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রের সুবিধা নিশ্চিত কল্পে অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। সুপেয় পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

সাত) কৃষি ও কৃষক

কৃষি পণ্যের ন্যায্য দাম (উৎপাদন খরচের সাথে বাড়তি ৪০% যুক্ত করে) নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি ক্রয় কেন্দ্র চালু এবং উৎপাদক ও ভোক্তা সমবায় গড়ে তোলা হবে। আলুসহ পচনশীল কৃষি পণ্যের জন্য পর্যাপ্ত হিমাগার স্থাপন করা হবে। কৃষি পণ্যের পরিবহনের জন্য বিশেষায়িত পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করা হবে। স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে ঋণ মওকুফ করা হবে। সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল, বিদ্যুৎসহ কৃষি উপকরণে ভর্তুকি দেয়া হবে; ন্যায্য মূল্যে ও যথা সময়ে কৃষকের কাছে পৌঁছানো হবে। বিএডিসিকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের জন্য সামরিক বাহিনীর দরে রেশনের ব্যবস্থা করা হবে। খেতমজুরদের সারা বছর কাজের নিশ্চয়তা বিধানে ১ শত দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। সেফটি নেটের আওতা ও বরাদ্দ বাড়ানো হবে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে সোশ্যাল সেফটি নেট এর দুর্নীতি, দলীয়করণ বন্ধ করা হবে। খাস জমি উদ্ধার করে প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে সমবায়ের ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া হবে। ১ লক্ষ ৬৮ হাজার কৃষকদের নামে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা ও ১০ হাজারের অধিক কৃষকের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করা হবে। ক্রমান্বয়ে রাসায়নিক ও কীটনাশক থেকে জৈব সারের সর্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। পোলট্রি ফিড, ফিস ফিড ও লাইভ

Scanned with CamScanner

স্টক ফিড এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ভূমি অফিস, তহসিল অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস, রেজিস্ট্রি অফিসের হয়রানী, দুর্নীতি বন্ধ করা হবে। জাতীয়ভাবে উৎপাদন সম্ভব তেমন পণ্য ও বিলাসী দ্রব্য আমদানী বন্ধ করা হবে। আবাদি কৃষি জমি সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হবে। কল্যাণমুখী সমতা নীতির ভিত্তিতে আমূল ভূমি সংস্কার করা হবে যাতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

আট) শ্রমিক

শ্রম আইনের অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাতিল করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রবর্তন করা হবে। নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনা এবং গণতান্ত্রিক সড়ক পরিবহণ আইন প্রণয়ন করা হবে। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি বৈষম্য দূর করা হবে। শ্রমিক অঞ্চলে চাইল্ড কেয়ার সেন্টার তৈরি করা হবে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুতে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। পে-স্কেলে নির্ধারিত সরকারি কর্মচারীদের জন্য ১৭ হাজার ৮শত টাকা মোট মজুরির সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারি-বেসরকারি মজুরি বৈষম্য দূর করে গার্মেন্টসসহ সকল শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হবে। শ্রমিকদের জন্য রেশনিং চালু করা হবে। শ্রমিকদের জন্য শিল্পাঞ্চলে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। শ্রমিকদের চাকরির স্থায়িত্ব বিধান করতে আউট সোর্সিং বন্ধ করা হবে। চা, তাঁতসহ বিশেষ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য দূর করা হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের অভিবাসন ব্যয় কমানো হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মস্থল ও আবাসস্থলে উন্নত পরিবেশ তৈরির ব্যাপারে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা হবে। দেশে তাদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। প্রবাসীদের আয়ের একটা অংশ তাদের সম্মতিতে শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। যাতে তারা দেশে ফিরে নিরাপদ জীবন-যাপন করতে পারেন। আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার অবাধ করা হবে।

নয়) পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মোকাবেলার উদ্যোগ নেয়া হবে এবং জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় বৈশ্বিক আন্দোলন জোরদার করতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ আরো কার্যকর করা হবে। পরিবেশ ধ্বংস করে তথাকথিত উন্নয়ন নয় বরং বন-পাহাড়-নদীসহ প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা হবে। পরিবেশ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পরিবেশ বান্ধব করা হবে। সকল নদী দূষণ ও দখল, বন-পাহাড় দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে এবং দখলদারদের কঠোর শাস্তির বিধান করা হবে। বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ করে খাস জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণ করে বস্তিবাসীসহ স্বল্প আয়ের মানুষদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা না করে হকার, রিক্সা উচ্ছেদ বন্ধ করা হবে। শহরে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত স্বার্থ সংরক্ষণ করে বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন সময়োপযোগি ও বাস্তবায়ন করা, কৃষি জমি অধিগ্রহণ করে বিত্তবানদের জন্য হাউজিং নির্মাণ বন্ধ করা হবে। পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৪, শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬, বিপদজনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০০৯, বাংলাদেশ

Scanned with CamScanner

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (সংশোধিত) ২০১০, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩, বাংলাদেশ জীব নিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২, পরিবেশ আদালত আইন ২০১০, বাংলাদেশ পরিবেশ জীব বৈচিত্র আইন ২০১৭, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, নিরাপদ খাদ্য বিধিমালা ২০১৪, ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫ ইত্যাদি আইনবিধি পর্যালোচনা করে মানুষের স্বাস্থ্য, প্রাণীর স্বাস্থ্য ও উদ্ভিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপযোগি পূনর্বিন্যস্ত করে আইনের প্রয়োগে সকল শিথিলতা ও উদাসীনতা দূর করা হবে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের লোকবল বৃদ্ধি করে তাকে কার্যকর ও গতিশীল করা হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে।

দশ) তেল, গ্যাস, জ্বালানী

তেল-গ্যাস-কয়লা, প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের দেশি-বিদেশি লুণ্ঠন বন্ধ করা হবে। তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ক্ষেত্রসমূহ বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দেয়া জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি বাতিল করা হবে। বাপেক্স পেট্রোবাংলাসহ দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়াতে বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। দুর্নীতি, ভুল নীতি, অপচয় বন্ধ করে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম কমানো হবে। ফুলবাড়িতে উন্মুক্ত খনন, রামপালে সুন্দরবন বিধ্বংসী কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প, রূপপুর মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ প্রকৃতি পরিবেশ ও জীবনের জন্য ক্ষতিকর ঝুকিপূর্ণ প্রকল্প পূনমূল্যায়ণ ও প্রয়োজনে বন্ধ করা হবে। জাতীয় কমিটির বিকল্প জ্বালানিনীতি বাস্তবায়ন করা হবে।

এগার) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সাম্প্রদায়িকতা

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার আইন করে নিষিদ্ধ করা হবে। অপঃসংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতাসহ সকল প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদপদতা দূরীকরণের জন্য সুস্থ প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার করা হবে। সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। সকল ধর্মের, পাহাড় সমতলসহ সকল আদিবাসী নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ভূমির অধিকারসহ সকল নাগরিক অধিকার রক্ষা করা হবে। দলিতসহ নিপীড়িত বঞ্চিতদের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হবে। উর্দুভাষী নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ পুনর্বাসন করা হবে গণতান্ত্রিক আইন, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি বিরোধী ফতোয়া আইন করে নিষিদ্ধ করা হবে। ফতোয়া বিষয়ে হাইকোর্টের দেয়া রায় বাস্তবায়ন করা হবে।

সিনেমা, নাটক, বিজ্ঞাপনসহ সকল প্রচার মাধ্যমে নারীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন বন্ধসহ অশ্লিলতা-অপসংস্কৃতি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। সুস্থ্য ধারার নাটক, সিনেমাসহ সকল সাংস্কৃতিক আয়োজনে উৎসাহ ও বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

বার) নারী

নারী-শিশু-প্রতিবন্ধীদের জান-মাল ইজ্জত ও শংকামুক্ত স্বাধীন বিকাশের জীবন উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে, বাল্য বিবাহ রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। বিয়ের বয়স

Scanned with CamScanner

সর্বনিম্ন ২০ করা হবে। নারীর উপর সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধ, সংসদে সরাসরি নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি করা হবে, সিডও সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে। ইউনিফরম সিভিল কোড চালু করা হবে। গার্হস্থ্য শ্রমকে মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেয়া হবে। সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করা হবে।

তের) প্রতিরক্ষা

অস্বাভাবিক সামরিক ব্যয় কমিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্ম সংস্থানের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হবে। প্রতিটি সক্ষম নারী পুরুষকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রতিরক্ষা নীতি, বাজেটসহ সশস্ত্র বাহিনীর যাবতীয় কার্যক্রম জাতীয় সংসদের কাছে দায়বদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

চৌদ্দ) কর্মসংস্থান

সকল কর্মক্ষম মানুষের কর্মসংস্থানে উদ্যোগ নেয়া হবে। অন্যথায় বেকার ভাতা প্রদান করা হবে। সরকারি সকল শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ দেয়া হবে। সরকারি চাকুরিতে কোটার যৌক্তিক সংস্কার ও চাকরির বয়সসীমা ৩৫ এ উন্নীত করা হবে। ঘুষ ছাড়া চাকরির নিশ্চয়তা বিধান ও নিয়োগ বাণিজ্য, প্রমোশন বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, সীট বাণিজ্য রোধ করা হবে। নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনকারীদের ৬ দফা বাস্তবায়ন করা হবে। নৌ পরিবহনকে প্রধান করে দ্বিতীয় রেল পরিবহন ও তৃতীয় পরিবেশ বান্ধব সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

পনের) পানি সম্পদের উন্নয়ন ও বন্যা সমস্যা প্রতিকার :

তিস্তাসহ সকল আন্তর্জাতিক নদ-নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলে পারস্পরিক আলোচনা ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কূটনৈতিকভাবে সমাধানের জোরদার উদ্যোগ নেয়া হবে। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে উপরিভাগের পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। নদী-খাল খনন করা হবে। বর্ষা মৌসুমের পানি সেচের জন্য ধরে রাখতে জলাধার নির্মাণের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ষোল) যুব সমাজ ও তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগানো

যুব সমাজের মধ্যে অনিশ্চয়তা, হতাশা, বেকারত্ব দূর করার যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে। মাদকাশক্তি, উশৃঙ্খলতা, নৈতিকতাহীনতার গ্রাস থেকে তরুণ যুবসমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও গডফাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। পর্ণোগ্রাফী, অশ্লীল চলচ্চিত্র, পর্ণোপত্রিকা ইত্যাদি তৈরি ও আমদানি কঠোরভাবে রোধ করা হবে। তারুণ্য ও যৌবনের শক্তিকে দেশ গড়ার ও মানবকল্যাণে ব্যবহারে যথপোযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

সতের) পররাষ্ট্রনীতি :

সংবিধান অনুযায়ী জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা হবে। পারস্পরিক স্বার্থ, সমমর্যাদা ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার ভিত্তিতে বিশ্বের সব দেশের সাথে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বজায় রাখা হবে।

Scanned with CamScanner

ভারতের সাথে ঝুলে থাকা অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, সীমান্ত হত্যা, বাণিজ্য বৈষম্য এবং পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রাপ্য সম্পদ আদায় ইত্যাদি সমস্যার ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রেখে সমাধান করা। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৫ : গ) (সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায় সংগত সংগামকে সমর্থন করিবেন।) পরিপূর্ণভাবে নির্ভয়ে মেনে চলা হবে।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

জনস্বার্থে যে কোন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে গেলে জনমত ও জনউদ্যোগ ছাড়া হয় না। তাই নির্বাচন পূর্ব আমাদের বক্তব্য ও করণীয় কীভাবে আরও পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবায়ন করা যায় নির্বাচন উত্তর সে উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করবো।

জয় সমাজতন্ত্র
জয় জনতার জয়

বি.দ্র. : সংবাদ সম্মেলনে নির্বচনী ইশতেহার প্রকাশের সময় তাৎক্ষনিক দু' চারটি পরামর্শ এসেছিল, সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে ছোট কিছু সংশোধনি যুক্ত করে ইশতেহারটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হলো। তারপরও আমরা এটিকে পূর্ণাঙ্গ মনে করছিনা। আমরা আরও মতামত-পরামর্শ প্রত্যাশা করি, যাতে জনগণের চাওয়াকে আরও ভালোভাবে ধারণ করতে পারি।

ধন্যবাদান্তে
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে
খালেকুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক

Scanned with CamScanner

দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হোন

মই মার্কায় ভোট দিয়ে বামপন্থার অন্যতম শক্তি বাসদ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে

নির্বাচনী ইশতেহার

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

কেন্দ্রীয় কমিটি

২৩/২ তোপখানা রোড (৩য় তলা) ঢাকা-১০০০।

ফোন : ৯৫৮২২০৬; ফ্যাক্স : ৯৫৫৪৭৭২; E-mail : mail@spb.org.bd

Scanned with CamScanner